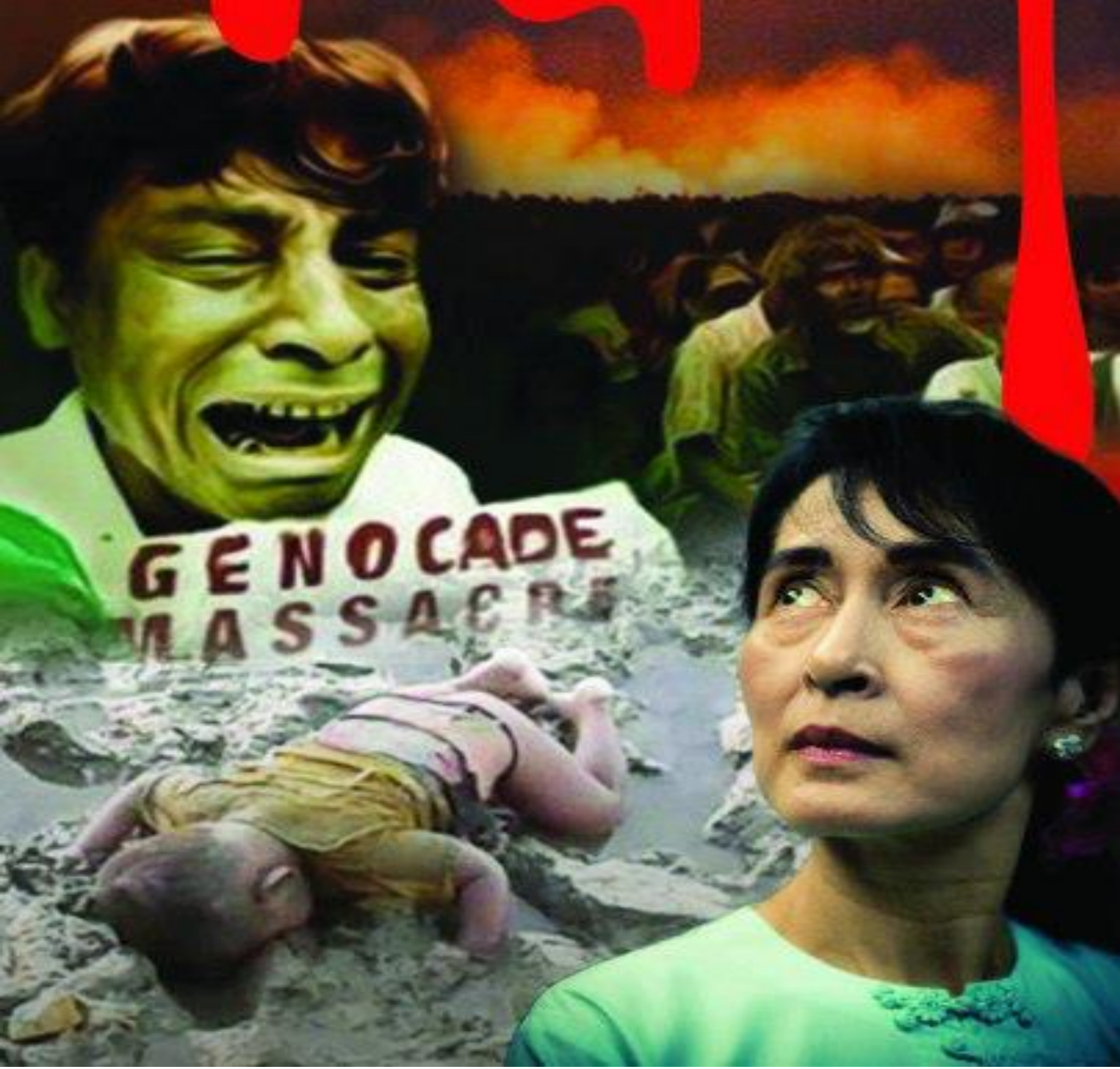


# রোহিঙ্গা গণহত্যা কাঠগড়ায় সুচি

ইমরুল কায়েস



# রোহিঙ্গা গণহত্যা : কাঠগড়ায় সু চি

ইমরুল কায়েস



## প্রকাশকের কথা

ইতিহাসের বইয়ে কিংবা পত্রিকার খবরে পৃথিবীর নৃশংস গণহত্যাগুলোর বেদনা বিধুর বর্ণনা পড়েছি। সেই বর্বরতা চাক্ষুষ দেখার কষ্ট পেতে হয়নি। কিন্তু আমাদের জীবদ্দশায় ঘটে যাওয়া এক নারকীয় গণহত্যার চাক্ষুষ সাক্ষী আমরা। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের প্রতিবেশী মায়ানমারের সামরিক জাভা প্রভাবিত সরকারের নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের বলি হওয়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর করুণ ইতিহাস লিখতে হচ্ছে। ‘রোহিঙ্গা গণহত্যা : কাঠগড়ায় সু চি’ গ্রন্থে লেখক ইমরুল কায়েস রোহিঙ্গাদের অতীত, বর্তমানকে খুব গুছিয়ে উপস্থাপন করেছেন।

আরাকানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে সম্মানিত পাঠকবৃন্দ নিশ্চয় পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তবুও কেন এই বই? মূলত দুটি দিক বিবেচনায় আমরা এই বই ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করছি। প্রথমত, ইতিহাসের একটা দায়বদ্ধতা আছে। আজ থেকে এক হাজার বছর পরের প্রজন্ম আরাকানের বর্তমান সময়ের নিষ্ঠুরতা জানতে চাইবে। আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তথ্য দুনিয়ায় এই বইটি উপস্থাপন করলাম। এখন থেকে পরবর্তী সময়ের যে কেউ সঠিক ইতিহাস জানতে পারবে ইনশাআল্লাহ। দ্বিতীয়ত, পরিকল্পিতভাবে শিক্ষা বঞ্চিত রোহিঙ্গা মুসলিমদের স্বাধীনতার সুখই বুঝতে দেয়া হচ্ছে না। আমাদের বিশ্বাস কেউ না কেউ দাঁড়িয়ে যাবে। আত্মাধিকারের স্বীকৃতি পেতে মুক্তির মিছিল শুরু হবে আরাকানের মাটিতে। এই বই ভবিষ্যতের রোহিঙ্গা জাগরণের অগ্রপথিকদের কিছুটা পথ দেখাবে বলে আশা করছি।

ইমরুল কায়েস ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অত্যন্ত বিনয়ী এই মানুষটি এই বই নিয়ে কতটা সিরিয়াস ছিলেন, আমি জানি। আরাকানের মজলুমদের এই কঠিন সময়ে ‘গার্ডিয়ান পাবলিকেশন’ বইটি প্রকাশের অংশ হতে পেরে কৃতজ্ঞ। আজ হোক, কাল হোক- আরাকানের মুক্তির ভোর আসবেই।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের

বাংলাবাজার, ঢাকা।

২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

## লেখকের কথা

সাম্প্রতিক সময়ে রোহিঙ্গাদের ভয়াবহ গণহত্যা ও বিতাড়িত হবার পটভূমিতেই ‘রোহিঙ্গা গণহত্যা : কাঠগড়ায় সু চি’ বইটি লেখা হয়েছে। বইটিতে হয়তো রোহিঙ্গা মুসলমানদের করুণ দুর্দশা ও নির্যাতনের সমগ্র চিত্রের সবটাই তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। তবে প্রামাণ্য তথ্যভিত্তিক লেখা বইটি পড়লে সহজেই রোহিঙ্গাদের করুণ অবস্থার পুরো চিত্র সম্পর্কে ধারণা লাভ হবে। পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত এ বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলমান, রাখাইন মগ ও বর্মীদের আগমনের ইতিহাস তুলে ধরার পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের বর্তমান প্রজন্ম যে সেখানে বহিরাগত নয়, তা তথ্য-উপাত্ত ও যুক্তির আলোকে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ইতিহাসের নানা বাঁকে আরাকানে বসতিগাড়া এই তিন জাতির একে-অপরকে বহিরাগত বলার নৈতিক ভিত্তি নেই, বর্মীদের তো নয়ই। কারণ, তারাই সেখানে সবার পরে এসেছে, তাও আবার দখলদার হিসেবে। বর্মীদের ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশলই যে আরাকানে যুগ যুগ ধরে শান্তিতে সহাবস্থান করে আসা রোহিঙ্গা ও মগ দ্বন্দের কারণ, তা দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই উঠে এসেছে। একই সাথে ২০১৭ সালের রোহিঙ্গা গণহত্যা ও উচ্ছেদ অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ, পূর্বপরিকল্পিত এ অভিযানের প্রেক্ষাপট তৈরি করতেই যে মিয়ানমার সরকার ও সেনাবাহিনী ২৫ আগস্ট সাজানো হামলার ঘটনা ঘটায় তা তথ্য-প্রমাণের আলোকে তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে গণতান্ত্রিক ছদ্মবরণে ডাইনিরূপী অং সান সু চির মুখোশ বিশ্ববাসীর সামনে খোলাশা করার পাশাপাশি সে ও তার সেনাপ্রধানকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর পন্থা নির্দেশের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। আর চতুর্থ অধ্যায়ে রোহিঙ্গা ইস্যুকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, চীন, রাশিয়াসহ পরাশক্তিগুলোর স্বার্থগত দ্বন্দ্ব, জাতিসংঘের টিমেতালে ভূমিকা, মুসলিমবিশ্ব তথা ওআইসি’র ‘এই আছি, এই নাই’ ভূমিকার কারণ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা সবিস্তারে ও নির্মোহভাবে বর্ণনার পাশাপাশি বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সংকট সমাধানে আরও কী করা যেতে পারে, সে বিষয়ে কিছু নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে ‘কফি আনান কমিশন’-এর সুপারিশের পূর্ণ বাস্তবায়নই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উপায় বলে আমার বিশ্বাস। তাই এই সুপারিশমালাও বইয়ে সংযোজন করা হয়েছে। আশা করি পাঠকরা বইটি থেকে রোহিঙ্গাদের অতীত, বর্তমান- এমনকি ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও মোটামুটি ধারণা লাভ করতে পারবেন।

রোহিঙ্গাদের নিয়ে কখনো লিখব বা লিখতে হবে, সে ভাবনা গোড়াতে ছিল না। তবে সাম্প্রতিককালে (২০১৬ ও ২০১৭ সালে) মিয়ানমারের রোহিঙ্গা বিরোধী ভয়াবহ গণহত্যা অভিযান, এ বিষয়ে লেখার ভাবনা মাথায় নিয়ে আসে। এক্ষেত্রে বাংলাভিশনের অ্যাডভাইজার (এনসিএ) ড. আবদুল হাই সিদ্দিক মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ।

কারণ, তিনিই একদিন আলাপের এক ফাঁকে রোহিঙ্গা বিষয়ক লেখার ভাবনা মাথায় ঢুকিয়ে দেন। পরবর্তী সময়ে লেখার বিষয়ে তিনি খোঁজখবরও নিয়েছেন। আরেকজন ব্যক্তি যিনি এই বইটি লেখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় পরামর্শ দিয়েছেন ও খোঁজ খবর নিয়েছেন, তিনি হলেন বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় কলামিস্ট তরুণ আইনজীবী ব্যারিস্টার সাইফুর রহমান। লেখালেখিতে সব সময় উৎসাহ দেয়ার জন্য বন্ধুপ্রতিম এই সজ্জন ব্যক্তিটিকে ধন্যবাদ জানাই। রোহিঙ্গাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে ড. মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহ ছিদ্দিকী সম্পাদিত এবং ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মুহাম্মদ সিদ্দিক খানসহ বেশ কয়েকজন প্রথিতযশা লেখকের প্রবন্ধ সংকলণ গ্রন্থ ‘আরাকানের মুসলমান : ইতিহাস ও ঐতিহ্য’ এবং ড. মাহফুজুর রহমান লিখিত ‘আরাকানের মুসলমানদের ইতিহাস’ বই দুটি ব্যাপক সাহায্য করেছে। তাদের সবাইকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ রাখব। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৈনিকে প্রকাশিত বিখ্যাত কলামিস্ট ও সাংবাদিকদের এ সংক্রান্ত অনেক লেখা এবং প্রতিবেদন আমাকে দারুণভাবে সহায়তা করেছে। তাদের সবার নাম লিখতে গেলে কলেবর বেড়ে যাবে বিধায় সে চেষ্টায় ক্ষান্ত দিলাম। তবে সবার প্রতিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। নানা সময়ে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে সহায়তার জন্য বাংলাভিশনের হেড অব নিউজ মোস্তফা ফিরোজ, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সিনিয়র পেশ ইমাম মুফতি মিজানুর রহমান, ইসলামি ফাউন্ডেশনের সাবেক কর্মকর্তা নুরুজ্জামান ফারুকী এবং পত্রিকার কাটিং ও তথ্য-উপাত্ত সরবরাহের জন্য ছড়াকার আবু বকর সিদ্দিক, হাফেজ আকরাম হোসেন ও শোয়াইবুর রহমানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। লেখালেখিতে সব সময় প্রেরণা দেয়ার জন্য পাবনার সুজানগরে চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন প্রতিষ্ঠিত জাহানারা কাঞ্চন স্মৃতি উচ্চবিদ্যালয়ের সভাপতি আমার বাবা আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা, মাতা হাসিনা বেগম, শ্বশুর সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল গফুর, শাশুড়ী মরিয়ম মির, বড় মামা সাইদুল ইসলাম, মেজো মামা জহুরুল ইসলাম, সেজো মামা সিরাজুল ইসলাম, ছোট মামা আমিরুল ইসলাম, শিক্ষক মো. খলিলুর রহমান স্যার ও ভায়রা ভাই জিয়াউর রহমানকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার দুই ভাই মোস্তফা কামাল ও আতিকুল আলম, বোন নুরজাহান পারভিন, দুলাভাই সাহাবুল আলম, ভাগ্নী রুকাইয়া আলম, ভাগ্নে অপূর্ব,

শ্যালকদ্বয় জাহিদ খোকন ও জাহিদ সুমন এবং সহকর্মী মেহরাব হোসাইন খানও লেখালেখির উৎসাহ দাতাদের মধ্যে অন্যতম। স্ত্রী মৌসুমী আক্তার স্বপ্নার ঐকান্তিক সহায়তা ও উৎসাহ এবং ছেলে ইমরুল জিসান সাদের বাবার লেখা বই পড়বার আগ্রহ, এই বই লেখার ক্ষেত্রে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। সর্বোপরি বই প্রকাশে সহায়তার জন্য ‘গার্ডিয়ান পাবলিকেশন’-এর প্রকাশক নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের এবং তরুণ সাংবাদিক মুজাহিদ শুভকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ ও শুভ কামনা জানাচ্ছি।

ইমরুল কায়েস

৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ ঢাকা।

## সূচিপত্র

আরাকানের অবস্থান ও প্রাথমিক ইতিহাস	১১
আরাকানে মুসলমানদের আগমন ও রোহিঙ্গাদের উদ্ভব	১৬
থান্ডইক্যা বা থাডুকেয়া	২১
জেরবাদী	২১
কামানচি	২১
রোহিঙ্গা	২২
আরাকানের রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং সামাজিক জীবনে মুসলমান ও রোহিঙ্গারা	২৪
মিয়ানমার ও আরাকানের রাজনীতিতে মুসলমান ও রোহিঙ্গা	২৯
আরাকানে মগ বা রাখাইন ও বৌদ্ধবাদের আগমন	৩১
রোহিঙ্গারা বহিরাগত হলে বর্মি-রাখাইন সবাই বহিরাগত	৩৫
মগদের রোহিঙ্গা বিদ্বেষী হবার কারণ ও রোহিঙ্গা বঞ্চনার সূত্রপাত	৪১
জাভা সরকারের নির্যাতন ও গণহত্যা	৪৪
২০১২ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও রোহিঙ্গাদের বিতাড়ন	৪৭
সাম্প্রতিক রোহিঙ্গা গণহত্যা (২০১৬-১৭) : ক্লিয়ারেন্স অপারেশন (২০১৬)	৫০
ক্লিয়ারেন্স অপারেশন (২০১৭)	৫২
সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক ও ত্রাণকর্মী প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা	৫৫
গণমাধ্যম, নির্যাতিত ও প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে বর্মী বাহিনীর নৃশংসতা (২০১৭)	৫৫
সীমান্তে স্থল মাইন পুঁতে রোহিঙ্গা হত্যা	৬০
রোহিঙ্গা নির্যাতনে জঙ্গি ও উগ্র বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও জড়িত	৬১
‘গণহত্যা’, ‘জাতিগত নির্মূল’ গণধর্ষণসহ মানবতাবিরোধী অপরাধ	৬২
‘জাতিগত নির্মূল’	৬৩
মিয়ানমার কেন রোহিঙ্গাদের তাড়াতে চায়	৭১



রোহিঙ্গা সংকট ও সু চি	৭৬
যে কারণে সু চি রোহিঙ্গা বিদ্বেষী	৭৬
রোহিঙ্গা নিধন নিয়ে সু চির মিথ্যাচার	৭৯
বিশ্বাসঘাতক সু চি	৮২
বাংলাদেশের সাথে আলোচনার নামে সু চির ভাঁওতাবাজি	৮৫
সু চির সমালোচনায় জীবনীকার, নোবেল বিজয়ী ও অন্যরা	৮৮
সু চির নোবেল কেন প্রত্যাহার হবে না	৯০
সু চির লোক দেখানো তদন্ত কমিশন গঠন	৯২
রোহিঙ্গা ইস্যু চাপা দিতে সু চি ও জেনারেল হুইং এর কূটকৌশল	৯৪
কফি আনান কমিশন ও সু চির চাতুরিপনা	৯৫
রোহিঙ্গা গণহত্যা : কাঠগড়ায় সু চি ও জেনারেল হুইং	৯৮
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অবস্থান ও কূটনৈতিক তৎপরতা	১০৭
জাতিসংঘের প্রশ্নবিদ্ধ ভূমিকা	১০৭
জাতিসংঘের তদন্ত দল ও সু চির ভণ্ডামি	১১৩
যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপিয় ইউনিয়নের ভূমিকা	১১৪
যুক্তরাষ্ট্রের ফাঁকা বুলি	১১৬
যুক্তরাজ্যের দ্বৈত নীতি	১১৯
কানাডা	১১৯
ইউরোপিয় ইউনিয়নের দুর্বল ভূমিকা	১২২
পশ্চিমারা কেন কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে না	১২১
ভারত, চীন ও রাশিয়ার অবস্থান	১২২
ভারতের কৌশলী অবস্থান: পেছনে জাতীয় স্বার্থ	১২২
চীন কেন মিয়ানমারের পক্ষে	১২৬
রাশিয়ার বিতর্কিত ভূমিকা	১২৭
অস্ত্র ব্যবসায় চাপা রোহিঙ্গা ইস্যু	১২৮
ভূ-রাজনীতির কবলে রোহিঙ্গা ইস্যু	১২৯
ওআইসি ও মুসলিম দেশগুলোর ভূমিকা	১৩২



সোচ্চার মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়া-তুরস্ক	১৩৩
জাতিসংঘে ভোটদানে বিরত ইরান	১৩৬
অন্যান্য মুসলিম দেশের ভূমিকা	১৩৭
পাকিস্তান নিশ্চুপ কেন	১৩৭
সমালোচিত পোপ	১৩৯
<b>বাংলাদেশ ও রোহিঙ্গা সংকট</b>	<b>১৪৩</b>
বাংলাদেশে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুর ঢল	১৪৩
রোহিঙ্গা সংকটের প্রভাব	১৪৭
স্থানীয় জনসাধারণের সমস্যা	১৪৮
পরিবেশ ও পর্যটন সমস্যা	১৪৮
ঠেঙ্গার চরে স্থানান্তর	১৪৯
সংকট কাটাতে বাংলাদেশের পদক্ষেপ	১৫০
রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনে সমঝোতা : সম্ভাবনা নাকি অনিশ্চয়তা	১৫১
সংকটের স্থায়ী সমাধানে আরও কিছু করণীয়	১৫৫

## আরাকানের অবস্থান ও প্রাথমিক ইতিহাস

বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁষে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর আরাকান অঞ্চল। আরাকান বর্তমানে মিয়ানমারের একটি অঙ্গরাজ্য যেটি রাখাইন স্টেট নামে পরিচিত। এর উত্তরে মিয়ানমারের চিন প্রদেশ ও ভারত, দক্ষিণ ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর, উত্তর ও পশ্চিমে নাফ নদী এবং বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম, পূর্বে মিয়ানমারের বিশাল ইয়োমা পর্বতমালা। আরাকান হলো বাংলাদেশের বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলা সংলগ্ন। সমগ্র আরাকান অঞ্চলটি উত্তর-পশ্চিমে ১৭১ মাইলব্যাপী জল ও স্থল সীমারেখা সহকারে বাংলাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত। ৫০ মাইল দৈর্ঘ্য সম্পন্ন নাফ নদী দ্বারা আরাকান বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন। নাফ নদীর পূর্বতীরে আরাকানের মংডু টাউনশিপ এবং পশ্চিমতীরে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও পর্যটন কেন্দ্র সেন্টমার্টিন। পূর্বে আরাকানের আয়তন ছিল ২০ হাজার বর্গমাইল। ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা পরবর্তী পার্বত্য আরাকানকে মিয়ানমারের চিন প্রদেশ এবং দক্ষিণ আরাকানের কিছু অংশ ইরাবতী অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করায় বর্তমানে আরাকানের আয়তন প্রায় ১৪,২০০ বর্গমাইল<sup>১</sup>। আরাকানের দৈর্ঘ্য ৩৬০ মাইল। তবে প্রস্থে ভিন্নতা রয়েছে। উত্তর আরাকান অঞ্চলটি বেশ প্রশস্ত। এর প্রস্থ প্রায় ১০০ মাইল এবং দক্ষিণাংশে নিচের দিকে ক্রমশ সরু, যার প্রস্থ প্রায় ২০ মাইল। পূর্বে দুর্গম, দুর্ভেদ্য, বিশাল ও সুউচ্চ ইয়োমা পর্বতমালা আরাকানকে মিয়ানমারের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। ইয়োমা পর্বতমালা দক্ষিণে নেগ্রাইস অন্তরীপ থেকে শুরু হয়ে উত্তরে ৯৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে ভারতের মণিপুর পর্যন্ত পৌঁছেছে। এর মধ্যে নাগা, চিন, লুশাই এবং পাটকাই পাহাড় অন্তর্গত। এর বেশিরভাগ পর্বতের উচ্চতা ৯১৫ থেকে ১৫২৫ মিটার। আরাকান ইয়োমার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট ভিষ্টোরিয়া, এর উচ্চতা ৩,০৫৩ মিটার। এই বিশাল পর্বতমালাই ভৌগলিকভাবে আরাকানকে মিয়ানমারের মূল ভূ-খন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

খ্রিষ্টপূর্বাব্দকালেই আরাকানে জনবসতি গড়ে ওঠে বলে সেখান থেকে উদ্ধার হওয়া, বিভিন্ন শিলালিপি থেকে জানা যায়। আরাকানের প্রাচীন জনগণ বলতে মঙ্গলীয়, ভোট চীনা, মুরং, খুমী, চাক, সিন, সেন্দুজ, মো, খ্যাং, উইনাক, মারু, পিউ প্রভৃতি কিরাত উপজাতীর জনগোষ্ঠীকে বুঝায়<sup>২</sup>। পরবর্তীকালে আরব, ইরানী, আফগানী, গৌড়ীয় ও ভারতীয়সহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলমানরা আরাকানে এসে বসতি স্থাপন করে।

তারা এখানকার জনগোষ্ঠীর মহিলাদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতো। এজন্য তাদের ঔরস ও গর্ভজাত আরাকানী বর্ণসংকর মুসলমান জনগোষ্ঠীর আকার-আকৃতি এবং দৈহিক গঠনে বৈচিত্র সৃষ্টি হয়। পূর্ব তিব্বত থেকে তিব্বত-বার্মান গোত্রের জনগোষ্ঠী প্রাচীনকালে আরাকানে এসে বসতি স্থাপন করে<sup>৩</sup>। তবে এর সঠিক সময় চিহ্নিত করা কঠিন।

মিয়ানমারের প্রাচীন রাজাদের কিংবদন্তীমূলক উপাখ্যান মহারাজোয়াং-এর উদ্ধৃতি দিয়ে ঐতিহাসিক এ. পি. ফেয়ার উল্লেখ করেন, প্রাচীনকালে আরাকানের রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল মারু রাজবংশ। তারা ২৬৬৬ অব্দে আরাকানের রাজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন<sup>৪</sup>। ভারতের কাশীধামের বেনারস অঞ্চলের এক সামন্ত রাজা আরাকানে এসে একটি রাজ্যস্থাপন করে শাসনকার্য পরিচালনা শুরু করেন। বর্তমান স্যাভোয়ে শহরের নিকটবর্তী রামরিতে তিনি রাজধানী স্থাপন করেন। তারই বংশধরগণ দীর্ঘদিন আরাকান শাসন করেন। তাদের শাসনের শেষ পর্যায়ে আরাকানে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। রাজ্যে অশান্তির কারণে প্রজা বিদ্রোহের ফলে রাজারা বিতাড়িত হন। তাদের একমাত্র কন্যাকে ক্ষমতায় বসায় প্রজারা। কিন্তু তিনি রামরি ত্যাগ করে এক ব্রাহ্মণ যুবককে বিয়ে করেন। ধন্যাবতী নামে তাদের একটি কন্যা সন্তান জন্মে। উক্ত কন্যাকে কালাদান নদীর তীরবর্তী মারুবংশীয় এক রাজপুত্র বিবাহ করেন এবং স্ত্রীর নামানুসারে ধন্যাবতী নগরী নাম দিয়ে সেখানে রাজধানী স্থাপন করে শাসনকার্য শুরু করেন। এ বংশের রাজাগন বংশ পরম্পরায় ১৮৩০ বছর আরাকানে রাজত্ব করেন। এ বংশের শেষ রাজার আমলে প্রজাগণ বিদ্রোহ করে রাজাকে হত্যা করে। তখন রানী দুই কন্যাসহ কাউকপাভায়াং পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মহারাজোয়াংয়ের আরেকটি কাহিনী সূত্রে জানা যায়, গৌতম বুদ্ধের জন্মের বহুপূর্বে অভিরাজ নামক একজন রাজার রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে, তিনি রাজ্য ত্যাগ করে বার্মার ইরাবতী নদীর তীরবর্তী ‘টাগাউন’ নামক স্থানে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব ছোট ভাই কানরাজি জয়ী হয়ে রাজা হন। বড় ভাই কানরাজগী উত্তর আরাকানের কাউকপাভায়াং পর্বতে গিয়ে আশ্রিত রাজকন্যাদের একজনকে বিবাহ করে সেখানে রাজ্য স্থাপন করেন। কানরাজগী বংশের ৬২জন রাজা ১৭ শ ৩২ বছর আরাকানে রাজত্ব করেন। এ বংশের পতনের পরই ১৪৬ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানে চন্দ্রসূর্য বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৪৬ খ্রিষ্টাব্দে মগধ (ভারতের বিহারের পাটনা ও গয়া জেলা মিলে মগধ গঠিত ছিল) থেকে চন্দ্রসূর্য নামে একজন সামন্ত রাজা আরাকান ও চট্টগ্রাম দখল করে সেখানকার রাজা হন।

আরাকানের পূর্ব রাজধানী ধন্যাবতীতেই তিনি রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি নিজে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন বলে, তার অনুসারীদের মধ্যে দুই ধর্মের লোকই ছিল। চন্দ্রসূর্য বংশের ২৫জন রাজা ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান শাসন করেন।

৭৮৮ সালে মহৎইঙ্গ চন্দ্র বৈশালীতে রাজধানী স্থাপন করে আরাকানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে চন্দ্র বংশীয় রাজত্বের সূচনা করেন। তার উদার নীতির কারণে আরাকানে ইসলাম প্রচার-প্রসার লাভ করে। এই বংশের ১২ জন শাসক ছিলেন। শেষ রাজা ঘামিংঘাতুম বর্মি উপজাতীদের অতর্কিত আক্রমণে নিহত হলে, তার ছেলে খেত্তাথিং সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি উপজাতি আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য রাজধানী পিনসা বা চাম্পাওয়াত নগরে স্থাপন করে, চাম্পাওয়াত রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এ রাজবংশের ১৫ জন রাজা আরাকান শাসন করেন। চাম্পাওয়াত রাজবংশের ৬ষ্ঠ রাজা পুন্নাকা-এর শাসনামলে ১০৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বার্মার অন্তর্গত পঁগা রাজ্যের রাজা আনাওয়ারাথা আরাকান দখল করে নিজ রাজ্যভুক্ত করেন এবং বৈশালী রাজকন্যা পঞ্চকল্যাণীকে বিয়ে করেন। এসময় চট্টগ্রামও দখল করে আনাওয়ারাথা পঁগা সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ফলে ১০৫৭ সাল থেকে বাকি ১০জন রাজা ১১০৩ সাল পর্যন্ত পঁগার করদরাজা হিসেবে আরাকানে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

১১০৩ সালে চাম্পাওয়াত রাজবংশের ভূতপূর্ব সপ্তম করদরাজা মিনবুলির পুত্র লেতিয়া মেংগাং আরাকানের সিংহাসনে আরোহণ করে রাজধানী চাম্পাওয়াত থেকে স্থানান্তর করে পেরিন-এ নিয়ে যান। পেরিন বংশের মোট ৮জন রাজা ১১০৩ থেকে ১১৬৭ সাল পর্যন্ত ৬৪ বছর আরাকানে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। পেরিন রাজবংশের অষ্টম ও শেষ রাজা অনানথিরির ভাই মেংফুনসা ১১৬৭ সালে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে রাজধানী পেরিন থেকে কিরিত নামক স্থানে নিয়ে কিরিত রাজবংশের শাসনের সূচনা করেন। এ বংশের ১৬ জন রাজা ১২৩৭ সাল পর্যন্ত আরাকানের ক্ষমতায় ছিলেন। চাম্পাওয়াত রাজা ঘানালুমের পুত্র লাংমা ফিউ ১২৩৭ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের শাসনভার গ্রহণপূর্বক রাজধানী লংগিয়েতে স্থানান্তর করেন। এ বংশে মোট ১৮ জন রাজা ১৪০৪ সাল পর্যন্ত আরাকানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ বংশের শেষ রাজা মিনসুয়া মুন বা নরমিখলা ১৪০৪ সালে দখলদার বর্মিরাজা মেঙ শো আই কর্তৃক উচ্ছেদ হলেও পরবর্তী সময়ে বাংলার সুলতান জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ শাহের সহায়তায় ১৪৩০ সালে আবারও আরাকান পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন এবং ম্রাউক উ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আরাকানের রাজধানী শ্রোহং এ স্থানান্তর করেন। ১৪৩০ থেকে ১৬৮৪ সাল পর্যন্ত ২৫৪ বছর আরাকান বাংলার করদরাজ্য হিসেবে শাসিত হয়।

এসময় আরাকানের রাজারা বৌদ্ধ নামের পাশাপাশি বাংলার সুলতানদের অনুকরণে ইসলামি নাম ধারণ করতেন (বিস্তারিত পরে আসছে)। ১৬৮৪ সাল থেকে ১৭৮৪ সালে বর্মি রাজা বোধপায়া দখলের আগ পর্যন্ত আরাকান মোটেও স্থিতিশীল ছিল না। ১৭১০ সালে সান্দা উইজ্যা ক্ষমতায় আসার পর ক্রমশ সামন্তদের ক্ষমতা বেড়ে যেতে থাকে এবং এক পর্যায়ে সামন্তদের নেতৃত্বে গোটা আরাকান ৬টি কেন্দ্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কোনো সামন্ত রাজ শক্তি সংগ্রহ করে রাজধানী মোহং দখল করতে উদ্যত হলে বাকিরা একত্রে জোট বেঁধে সে উদ্যোগ ব্যর্থ করে দিত।

১৭৮২ সালে রামরির সামন্ত রাজ থামাডা আরাকানের ক্ষমতা দখল করলে হারি নামক জনৈক সামন্ত অন্যদের সহায়তায় থামাডাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। হারি পূর্বসূরীর মতো সিংহাসনচ্যুত হবার ভয়ে বর্মি রাজের করদরাজা হিসেবে আরাকান শাসনে মনস্থির করেন। যাতে অন্য সামন্তরা ষড়যন্ত্র করতে না পারে— সেজন্য তিনি বার্মার আলাংপায়া বংশের রাজা বোধপায়ার সাথে চুক্তি করে তাকে আরাকান আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। রাজা বোধপায়া এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ১৭৮৪ সালে আরাকান দখল করে নেন। বোধপায়ার দখলের মধ্যদিয়ে আরাকানের স্বাধীনতা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে বর্মি রাজা বোধপায়া বিশ্বাসঘাতকতা করে তার আমন্ত্রণকারী আরাকানের রাজা হারিকে হত্যা করে। হারির ছেলে সিন পিয়ান পালিয়ে ব্রিটিশ শাসিত চট্টগ্রামে আশ্রয় নেন। সিন পিয়ান অনুগতদের নিয়ে আরাকানকে বার্মার দখল মুক্ত করতে বেশ কয়েক বছর লড়াই চালিয়ে যান। কয়েকবার বেশকিছু এলাকা দখল করতে সমর্থ হলেও, রাজধানী দখল করতে না পারায় তার আরাকান মুক্তি স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রয়োজনীয় লোকবল, সরঞ্জামের অভাব এবং ভারতবর্ষের দখলে থাকা বেনিয়া ব্রিটিশদের মামলা-হামলার কারণে তার মুক্তি সংগ্রাম সফল হয়নি। আরাকানে দখলদার বর্মি বাহিনী আর চট্টগ্রামে ব্রিটিশ বাহিনীর তাড়া খেয়ে দীর্ঘদিন বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে বিপর্যস্ত আরাকানের স্বাধীনতাকামী বীরপুরুষ সিন পিয়ান ১৮১৫ সালের ২৫ জানুয়ারি, পোলং চরানের পাহাড়ী এলাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আরাকানের স্বাধীনতার স্বপ্নেরও মৃত্যু হয়। অবশেষে ১৮২৬ সালে আরাকান ব্রিটিশদের দখলে আসে। ব্রিটিশ শাসনের পর ১৯৪৮ সালে বার্মার স্বাধীনতার সময় রোহিঙ্গা মুসলমানদের দাবি উপক্ষা করে বর্মি ও মগদের সাথে আঁতাত করে, কূটকৌশলী ব্রিটিশরা আরাকানকে বার্মার অংশ হিসেবে দিয়ে দেয়। ফলে আরাকানের স্বাধীনতা চিরতরে ভুলুষ্ঠিত হবার পাশাপাশি আরাকানবাসীরা বর্মিদের পদানত শোষিত শ্রেণিতে পরিণত হয়। তাদের মধ্য থেকে ধীরে ধীরে আরাকানী জাতীয়তার চেতনাও বিলুপ্ত হয়ে যায়।

আধুনিক আরাকান অঞ্চলটি সুদূর অতীতে চারটি ভৌগলিক সীমানায় বিভক্ত ছিল। সীমানাগুলো হলো- ধন্যাবতী, রামাবতী, মেখাবতী এবং দারাবতী<sup>৫</sup>। তৎকালীন ধন্যাবতী অঞ্চলটিই বর্তমান আরাকানের রাজধানী সিটওয়ে এলাকা। এছাড়া রামাবতী বর্তমানে রামরি দ্বীপ, মেখাবতী বর্তমান চেন্দুবা এবং দানাবতী বলতে আধুনিক স্যাভোয়েকে বুঝায়। পরবর্তী সময়ে সবগুলো অঞ্চল একত্রে আরাকান নামকরণ হয়েছে। যে এলাকাকে আমরা আরাকান বলি, ফার্সি ভাষায় তা ছিল আখরং বা আরাখং<sup>৬</sup>। মুঘল সম্রাট আকবরের সভাসদ আবুল ফজল তার ‘অইন-ই-আকবরী’ বইতে দেশটির নাম লিখেছেন আখরং। আরও পরে মুঘল আমলের গৌহাটি শহরের সুবেদার মির্জা নাথান এর ফার্সি ভাষায় লেখা ‘বাহারিস্তান-ই-গয়বী’ বইতে দেশটির নাম লিখেছেন আরাখং। ফার্সি আরাখং নামটি ব্রিটিশ আমলে ইংরেজিতে আরাকান হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু রোহিঙ্গা মুসলমানদের মতে, আরাকান নামটি অনেক পুরোনো। আরাকান শব্দটি মূলত আরকান; যা আরবি আরকুন শব্দের অপভ্রংশ। রুকন শব্দের অর্থ হলো স্তম্ভ বা খুঁটি। ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদকে রুকন বলা হয়। তাই রোহিঙ্গাদের ধারণা সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে তৎকালীন মুসলমানরা ইসলামের এই বুনিয়াদের দিকে খেয়াল রেখে আরাকান নামকরণ করেছিলেন<sup>৭</sup>।

কালাদান, লেমু ও মায়ু হলো আরাকানের উল্লেখযোগ্য তিনটি নদী। কালাদান নদীর মোহনায় আরাকানের বিখ্যাত আকিয়াব বন্দর গড়ে ওঠে। লেমু নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন সভ্যনগরী বৈশালী, লঙ্গিয়েত, পেরিন এবং ম্রাউক-রাজবংশের রাজধানী শহর মোহং; যা বর্তমানে পাথুরিকেল্লা নামে প্রসিদ্ধ। আরাকানে ছোটবড় প্রায় ১৭টি শহর আছে। শহরগুলো হলো- আকিয়াব, কিয়াউকপিউ, স্যাভোয়ে, কিয়াকতাউ, বুথিডং, মংডু, মিনবিয়া, ম্রাউক-উ, গোয়া, টংগু, পিউকতাউ, পোল্লগিউ, মেবন, মেনাং, রামরি, রাথিডং ও অন। বর্তমানে সিটওয়ে, স্যাভোয়ে, মায়ু ও কিয়াউপিউ-এ চারটিই আরাকানের প্রশাসনিক ইউনিট<sup>৮</sup>।

১৯৭৪ সালে জেনারেল নে উইনের জাভা সরকার আরাকানের নাম বদলে ‘রাখাইন স্টেট’ রাখে এবং একে রাজ্যের মর্যাদা দেয়। আরাকানের রাজধানী আকিয়াব। জাভা সরকার যার নাম বদলিয়ে রেখেছে সিটওয়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আরাকান বা রাখাইন প্রদেশে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে নিজস্ব সরকার ব্যবস্থা রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত একজন গভর্নর আছে। মুখ্যমন্ত্রী ও গভর্নর সাধারণত সেনাবাহিনীর সদস্য হয়ে থাকে। শাসকদের অবহেলার কারণে সমগ্র আরাকান অঞ্চল অনুন্নত ও অনগ্রসর। পুরো অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বলে কিছুই নেই। শিল্প-কারখানা কোন কিছুই তেমন গড়ে ওঠেনি। আরাকানের যোগাযোগের প্রধান ব্যবস্থা নদীপথ। সমগ্র অঞ্চলে কোন রেলপথ নেই। সকল মৌসুমে গাড়ি চলাচলের উপযোগী মাত্র দুটি সড়ক রয়েছে। একটি আকিয়াব থেকে ইয়ানবিয়েন পর্যন্ত; এর দৈর্ঘ্য

মাত্র ১৫ কিলোমিটার। অন্যটি মংডু থেকে বুথিডং পর্যন্ত যা ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ। ইয়োমা পর্বতের ভেতর দিয়ে দুর্গম গিরিপথ আরাকান ও মিয়ানমারের মধ্যে একমাত্র স্থূল পথ। সাধারণের পক্ষে এ পথ ব্যবহার করা সম্ভব নয়। আরাকানের লোকসংখ্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া কঠিন। কারন, আদমশুমারীতে রোহিঙ্গা মুসলমানদের গণনা করা হয় না। আরাকানের মুসলিম লেখকদের মতানুসারে আরাকানের মোট জনসংখ্যা ৫০ লাখ<sup>৯</sup>। এরমধ্যে ৩০ লাখ মুসলমান যা সমগ্র জনগোষ্ঠীর ৬০ শতাংশ। তবে ড. আবদুল করিম ও ইউএস কমিটি ফর রিফিউজিস এর মতে আরাকানের মোট জনসংখ্যা ৩৫ থেকে ৪০ লাখ। তন্মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মী রাখাইন বা মগ ২০ লাখ, রোহিঙ্গা মুসলমান ১৪ লাখ, সর্বপ্রাণবাদী ৪ লাখ এবং হিন্দু ও খ্রিষ্টান ২ লাখ।

### আরাকানে মুসলমানদের আগমন ও রোহিঙ্গাদের উদ্ভব

১৬৬৬ সালে মুঘল সুবেদার শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম দখল করার আগ পর্যন্ত ইতিহাসের বিশাল সময় জুড়ে আরাকান ও চট্টগ্রাম একই অঞ্চল ছিল। সেকারণে আরাকান ও চট্টগ্রামের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ দুএলাকায় ইসলামের আগমনও একই সময়ে ঘটেছে। খ্রিষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর পূর্বে থেকেই আরব বণিকরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক পথে ভারত, বার্মা ও চীনের ক্যান্টন বন্দরে বাণিজ্যিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। সে সূত্রে আরবের কুরাইশরা ইসলাম পূর্ব যুগেই এ বাণিজ্যপথে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। বিশেষত ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্য (ইরান) ও রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে অব্যাহত যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে আরবদের স্থূল বাণিজ্য পথ মারাত্মকভাবে বিপদ সংকুল হয়ে ওঠে। ইয়েমেন ও হাজরা মাউতের আরব বণিকদের নৌবাণিজ্যের পূর্ব অভিজ্ঞতার সুবাদে, আরবের কুরাইশরাও নৌবাণিজ্যে আগ্রহী হয়ে পড়ে। সেই সূত্রে মহানবি (সা.) এর আগমনের পূর্বেই তারা ভারতীয় উপমহাদেশে, বার্মা, কম্বোডিয়া ও চীনের ক্যান্টন পর্যন্ত বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপন করেছিল এবং ৬ষ্ঠ শতাব্দীর সূচনাতেই তারা দক্ষিণ ভারতের মালাবার, কালিকট, চেররবন্দর, আরাকানের আকিয়াব ও চট্টগ্রাম সমুদ্রোপকূলে স্থায়ী বাণিজ্যিক উপনিবেশে গড়ে তোলে। মুসলিম বণিকরা এসব অঞ্চল থেকে কাঠ, মসলা, সুগন্ধী দ্রব্য ও ঔষধি গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করতেন।

মূলত পবিত্র মক্কায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রায় সমসাময়িক কালে মহানবি (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই ভারতীয় উপমহাদেশ, চীনসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং আরাকান-চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যায়<sup>১০</sup>। এসময় সাহাবিরা ইসলামের দীক্ষা নিয়ে



বিশ্বের নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েন। তারা ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও আসেন। চীনের কোয়াংটা নদীর তীরে কোয়াংটা শহরে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন কাদেসিয়া যুদ্ধের বিজয়ী সেনাপতি হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের পিতা আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনে ওয়াইব (রা.)। এ শহরে এখনো তার কবর রয়েছে। আবু ওয়াক্কাস (রা.) মহানবি (সা.)-এর নবুয়তের ৭ম বছর ৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে হযরত কায়স ইবনে হুযায়ফা (রা.), হযরত ওরওয়াহ ইবনে আছাছা (রা.) এবং হযরত আবু কায়স ইবনে হারেছ (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক পথে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। তারা প্রথমে ভারতের মালাবার এসে উপস্থিত হন। সেখানকার রাজা চেরুমল পেরুমলসহ বহুসংখ্যক লোককে ইসলামে দীক্ষিত করে চীনের উদ্দেশ্যে সমুদ্র পথে যাত্রা করেন। ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দে তারা চীনের ক্যান্টন বন্দরে গিয়ে উপস্থিত হন। আবু ওয়াক্কাস (রা.) ৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে রওয়ানা দিয়ে প্রায় নয় বছর পর চীনে পৌঁছান। এ থেকে অনুমান করা যায়, এই নয় বছর তিনি পশ্চিমধ্যে বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলোতে ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যয় করেছেন। চীনে আগমনের জন্য আরবদেশ থেকে রওনা করলে বাতাসের গতিবেগের জন্য বিভিন্ন স্থানে জাহাজ নোঙর করতে হতো। বিশেষত বণিকেরা এক্ষেত্রে মালাবার, চেরর, চট্টগ্রাম, আকিয়াব, চীনের ক্যান্টন বন্দরে জাহাজ নোঙর করত। এ কারণে অনুমান করা যায় যে, তিনি মালাবারের পর চট্টগ্রাম ও আকিয়াব বন্দরে জাহাজ নোঙর করে ইসলাম প্রচারের কাজ করেছিলেন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ভারতবর্ষ ও আরাকানের মানুষের সাথে যে মুসলমানদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল, তা হাদিস থেকেও জানা যায়। হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিন্দের জনৈক শাসক মহানবি (সা.)-এর কাছে এক পোটলা হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন যার মধ্যে আদাও ছিল। মহানবি (সা.) তার সাহাবিদেরকে সে আদা খেতে দিয়েছিলেন আমাকেও এক টুকরা খেতে দিয়েছিলেন। হিন্দের কোন শাসক মহানবি (সা.)-এর কাছে হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। তবে বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত রুহ্মি রাজ্যের শাসকরা বহুকাল আগে থেকেই পারস্যের শাসকদের মূল্যবান উপহার বা হাদিয়া তোহফা পাঠাতেন। সম্ভবত এ রাজ্যেরই কোন শাসক মহানবি (সা.)-কে হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন। রুহ্মি রাজ্য সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য থাকলেও বেশিরভাগ ঐতিহাসিক মনে করেন, আরাকানই ছিল তৎকালীন রুহ্মি রাজ্য। কেননা, আরাকানের পূর্বনাম ছিল ‘রোখাম’। এটি একটি আরবি শব্দ যার অর্থ শ্বেতপাথর এবং আরাকানের প্রাচীন রাজধানী মোহং এর পূর্বনাম ‘কায়কপ্র’।

এটি বর্মি শব্দ, যার অর্থ শ্বেতপাথর। এদিক থেকে মনে হয় কায়কপ্রবণ এবং রোখাম বলতে একই অঞ্চল বুঝায়। এ কারণে রুহমি বলতে রোখাম বা আরাকানকেই বোঝায়। ধরে নেয়া হয়, রোখাম শব্দের বিকৃত রূপই রুহমি।

ঐতিহাসিক নাসিম বিন হাম্মাদ এর উদ্ধৃতিতে রুহমি রাজা কর্তৃক খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজকে (৭১২-৭২০) চিঠি পাঠানোর তথ্য পাওয়া যায়। চিঠিতে রুহমি রাজা এমন একজন ব্যক্তিকে পাঠানোর জন্য খলিফার কাছে অনুরোধ জানান, যিনি ইসলাম বুঝেন ও শুনতে পারেন। রুহমির শাসকের এই চিঠির উত্তরে নিশ্চয়ই খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ ইসলাম প্রচারের জন্য মুসলিম ধর্মপ্রচারকদের পাঠিয়েছিলেন এবং তারা রুহমি তথা আরাকান এলাকায় ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। সুপ্রসিদ্ধ আরব ভৌগলিক সুলায়মান ৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে রচিত তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘সিলসিলাত উত তাওয়ারিখ’ গ্রন্থে বঙ্গোপসাগরের তীরে রুহমি নামক একটি দেশের পরিচয় দিয়েছেন<sup>১১</sup>।

মহারাজোয়াং-এর তথ্যমতে, চন্দ্র বংশের প্রথম রাজা মহৎ ইঙ্গ চন্দ্র (৭৮৮-৮১০ খ্রী) ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে বৈশালিতে রাজধানী স্থাপন করে শাসন কাজ পরিচালনা শুরু করেন। তাঁর রাজত্বকালে (৭৮৮-৮১০ খ্রিষ্টাব্দ) আরব অঞ্চলের কয়েকটি বাণিজ্য জাহাজ রামরি দ্বীপের তীরে ভেঙে পড়ে বা ডুবে যায়। জাহাজের আরবীয় বণিকরা স্থানীয়দের সহায়তায় উদ্ধার পেয়ে কোন রকমে তীরে ভিড়লে স্থানীয়রা তাদেরকে রাজার কাছে নিয়ে যান। রাজা তাদের বুদ্ধিমত্তা ও উন্নত আচরণে মুগ্ধ হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি দেন।

আরবীয় মুসলিম বণিকরা স্থানীয় রমণীদের বিয়ে করে আরাকানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ব্রিটিশ শাসিত বার্মা গেজেটিয়ারেও এ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। (JASB, 1884, op.cit.,p-36.) রাজা মহৎ চন্দ্রের উদারনীতির কারণে মুসলমানরা ইসলাম প্রচারের ব্যাপক সুযোগ পায় এবং সেই সূত্রেই আরব মুসলিম বণিকরা রামরি বন্দরসহ আরাকানের নৌ-বন্দরগুলোতে ব্যাপকভাবে বাণিজ্যিক ও ইসলাম প্রচার মিশন পরিচালনা করতে থাকে। সেসময় বৈবাহিক সূত্রে অথবা আরবি মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে স্থানীয় অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এভাবে ৮ম শতাব্দী থেকে ১০ম শতাব্দী পর্যন্ত আরাকানের উপকূলীয় অঞ্চল হতে শুরু করে মেঘনা নদীর পূর্ব তীরবর্তী বিস্তীর্ণ বন্দরগুলো, আরব বণিকদের কর্মতৎপরতায় মুখর হয়ে ওঠে। এমনকি মুসলমানদের সুমহান আদর্শের প্রতি শাসকরাও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ার নিদর্শন পাওয়া যায়। কেননা খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ (৭১৭-৭২০খ্রি.) এবং আব্বাসীয় খলিফা মামুনকে (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) রুহমির

রাজা চিঠি লিখেছিলেন। আরাকানের শাসক যথাক্রমে রাজা সূর্যক্ষিতি (৭১৪-৭২৩ খ্রি.) এবং সূর্য ইঙ্গ চন্দ্র (৮১০-৮৩০ খ্রি.) এ চিঠিগুলো লিখেছিলেন বলে ধারণা করা হয়।

দশম ও একাদশ শতাব্দীতে আরব বণিক ও সুফি দরবেশদের মধ্যে বদরুদ্দিন (বদর শাহ) নামে একজন ইসলাম প্রাচরক এ অঞ্চলে আসেন এবং ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তার নামানুসারে আসামের সীমা থেকে শুরু করে মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে ‘বদর মোকাম’ নামে মসজিদ নির্মিত হয়। আকিয়াবে একটি টিলার উপর অবস্থিত বদর মোকামে দুটি দালান আছে। সেখানে একটি মসজিদ রয়েছে। পশ্চিমের দেয়ালে বদর মোকামের মূল পরিচালকের নিযুক্তিপত্র ফারসি ভাষায় লেখা হয়েছে। বদর মোকাম মসজিদের ভেতরে নির্দিষ্ট স্থানে একটি পাথর রয়েছে যেখানে পীর বদরের পায়ের পাতার চিহ্ন ও হাঁটুর দাগ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। ধারণা করা হয়, সারাক্ষণ ইবাদত ও সাধনায় মশগুল থাকার দরুন পাথরে তার পায়ের হাঁটুর দাগ বসে গেছে। আরাকানী জনগণসহ সমুদ্র পথে চলাচলকারী বণিক ও নাবিকরা তাঁকে ব্যাপক ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। পীর বদর সমুদ্র পথে যাতায়াত করতেন বলে নাবিকরা তাকে ‘দরিয়া পীর’ বলে স্মরণ করতেন। পীর বদরের আস্তানা, চিল্লাখানা বা দরগাহ সমুদ্রের উপকূলে। তাই ধারণা করা হয়, তিনি হয়ত আরবীয় কোনো দেশ থেকেই এসে থাকবেন। চট্টগ্রাম শহরেও পীর বদরের দরগা আছে। সুতরাং এ দুঅঞ্চলে পীর বদরের আস্তানা ছিল। এসব তথ্য থেকেও সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, সেই প্রাচীনকাল থেকেই আরাকানে আরবীয় মুসলমান সুফি, দরবেশরা ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসতেন এবং বসবাস করতেন। তাদের প্রভাবে স্থানীয় অনেকেই মুসলমান হয়েছেন। যেমনটি হয়েছে বাংলা অথবা ভারতীয় উপমহাদেশে। মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতা ১৩৪৬ সালে যখন চট্টগ্রাম-আরাকান সফর করেন, তখন সেখানে তিনি অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবার দেখেছিলেন।

পরবর্তীকালে যে তথ্যটি পাওয়া যায় তা হলো, ১৪০৪ খ্রিষ্টাব্দে মিন সুয়া মুন বা নরমিখলা নামে আরাকানের এক যুবরাজ পিতার মৃত্যুর পর ২৪ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরে মিন সুয়া মুন আরাকানের এক সামন্তরাজের ভগ্নিকে অপহরণ করলে সামন্ত রাজাগণ একত্রিত হয়ে বর্মিরাজ মেঙ শো আইকে আরাকান দখলে প্ররোচিত করেন। ১৪০৬ সালে বর্মিরাজ ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আরাকান দখল করলে মিন সুয়া মুন বাংলার রাজধানী গৌড়ে পালিয়ে আসেন। তখন ইলিয়াস শাহী রাজবংশ বাংলা শাসন করত। পরে ১৪৩০ খ্রিষ্টাব্দে গৌড়ের সুলতান জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ সেনাপতি ওয়ালি খানের নেতৃত্বে

বিশ হাজার সৈন্য দিয়ে মিন সুয়া মুনকে আরাকান দখলে সাহায্য করেন। কিন্তু আরাকান দখল করে ওয়ালি খান নিজেই রাজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। মিন সুয়া মুন পালিয়ে আবারও গৌড়ে চলে আসেন। এবার গৌড়রাজ সেনাপতি সিন্ধিখানের নেতৃত্বে ত্রিশ হাজার সেনা পাঠিয়ে মিন সুয়া মুনকে রাজ্য উদ্ধারে সাহায্য করেন। সিন্ধিখান যুদ্ধে ওয়ালি খানকে পরাজিত করে মিন সুয়া মুনকে রাজ্য ক্ষমতা ফিরিয়ে দেন। সিন্ধিখানের নামে মোহং বা পাথুরিকেল্লাতে এখনো একটি মসজিদ আছে। মিন সুয়া মুন বৌদ্ধ নাম বদলিয়ে মুহম্মদ সোলায়মান শাহ নামধারণ করে আরাকান বা রাখাইনের ক্ষমতায় বসেন<sup>১২</sup>। রাজকীয় আনুকূল্যে গৌড় থেকে যাওয়া প্রায় ৫০ হাজার মুসলমান সৈন্য-সামন্ত (যুদ্ধে হতাহত বাদে) আরাকানে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলেন। তাদের অনেকেই স্থানীয় রমণীদের বিয়ে করে সেখানে স্থায়ী আবাস গড়লে, মুসলমানদের বংশবিস্তার ঘটে। ক্রমশ এ বসতি লেঙ্গু নদীর তীরবর্তী বন্দরে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তীকালে রওয়ামা, নেদান পাড়, মোয়াল্লেম পাড়া, সফুচিক, ফুয়িপাড়া, কামার পাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলিম প্রভাবিত বসতি গড়ে ওঠে। রাজধানী মোহংকে সুরক্ষিত করার পাশাপাশি বার্মারাজ্যের সীমান্তবর্তী দক্ষিণ আরাকানের স্যাভোয়ে (চাঁদা) ও চকপিয়ু (কেত্র) সীমান্তের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে, সেখানে দুটি গৌড়ীয় বাহিনীর সেনানিবাস স্থাপন করা হয়। তারাও সেখানে স্থানীয় মহিলাদের বিয়ে করে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। তাদের বংশ বিস্তারের ফলে পরবর্তীকালে স্যাভোয়ের শোয়েজুঁবি, চানবি, নাজাবি, চন্দয়ক, থাডে, ছায়াডো, সিনবিনও, চকপিয়ুর ছনে, জালিয়াপাড়া, মেহেরবনু প্রভৃতি নামের বহু মুসলিম জনপদ গড়ে ওঠে। মিন সুয়া মুনের আরাকান পুণরুদ্ধারের পর বাংলার সেনাদের পাশাপাশি চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনেক মুসলমানও দেশের রাজধানী এলাকা তথা আরাকানে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে এভাবেই ব্যাপকভাবে মুসলিম জনবসতি গড়ে ওঠে।

আরাকানে মুসলিমদের আগমনের অন্য আরেকটি তথ্য হলো, মুঘল শাহজাদা সুজার মাধ্যমে আগত মুসলমানরা। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রি.) অসুস্থতার খবর শুনে তার পুত্র বাংলার সুবাদার শাহজাদা মুহাম্মদ সুজা (১৬৩৯-১৬৬০ খ্রি.), দক্ষিণাত্যের সুবাদার আওরঙ্গজেব এবং গুজরাটের সুবাদার মুরাদের মধ্যে শুরু হয় ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ। ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে আওরঙ্গজেব বিজয়ী হন। ১৬৫৯ সালের ৫ জানুয়ারি খাজওয়ার যুদ্ধে আরঙ্গজেবের কাছে পরাজিত হয়ে সুজা রাজধানী রাজমহল ছেড়ে ঢাকায় পালিয়ে আসেন। আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুমলার সৈন্যদল পিছু ধাওয়া করলে সুজা ১৬৬০ সালে

সপরিবারে আরাকানে আশ্রয় নেন<sup>১৩</sup>। তাঁর সাথে অনুগত পাঁচ শতাধিক সৈন্য-সামন্তও আরাকানে নিয়ে যান। সুজা মূলত মক্কা যাবার পরিকল্পনা করছিলেন। বর্ষাকালে যাত্রা বিপদসংকুল হতে পারে ভেবে তিনি শীতকালে মক্কা যাবার মনস্থ করেছিলেন এবং আরাকান রাজা সান্দা থু ধম্মা জাহাজ দিয়ে সহায়তাও করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন যেতেই সুজার সম্পদ ও অপূর্ব কন্যা আমেনার উপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে আরাকান রাজের। তিনি আমেনাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। সুজা এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করলে রাজা বিশ্বাসভঙ্গ করে ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি শাহসুজা ও পরবর্তীকালে তার পরিবারবর্গকে হত্যা করে। এসময় সুজার অনুচর এবং মুসলমানদেরকেও নির্যাতন করেন রাজা সান্দা থু ধম্মা। রাজা অনেককে জেলে নিক্ষেপ করেন। তবে পরবর্তীকালে সুজার সহচররা জেল থেকে মুক্তি পেলেও আর কেউ বাংলা বা মুঘল সাম্রাজ্যে ফিরে আসেনি বা আসতে পারেনি। তারা আরাকানেই অন্যান্য মূলসমানদের আশ্রয়ে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব তার ভাই সুজার হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ১৬৬৬ সালে বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খানকে আরাকানের অধীনস্থ চট্টগ্রাম দখলের নির্দেশ দেন। শায়েস্তা খানের সঙ্গে যুদ্ধে আরাকান রাজ পরাজিত হলে চট্টগ্রাম চিরকালের জন্য বাংলার অংশে পরিণত হয়।

১৮২৬ সালে আরাকান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলে চাকরি বা কাজের উদ্দেশ্যে বাঙ্গালি মুসলমান-হিন্দুদের অনেকেই আরাকানে পাড়ি জমান<sup>১৪</sup>। বাংলা থেকে অনেক মুসলমানকেই কৃষি কাজের জন্য ব্রিটিশরা আরাকানে নিয়ে যায়। এদের অনেকেই পরবর্তীকালে নিজ জন্মভূমিতে ফিরে আসলেও কেউ কেউ সেখানেই স্থায়ীভাবে থেকে যান। এরপর থেকে তাদের বংশধররা বংশ পরম্পরায় সেখানে বসবাস করে আসছেন। ব্রিটিশ আমলে একই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আরাকান থেকেও অনেকেই কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করেন। যেমন- কক্সবাজার জেলার হারবাং, মানিকপুর, রামু, কক্সবাজার সদর, খুরুস্কুল, চৌফলদণ্ডী, মহেশখালী, খারাংখালি, হিলা, চৌধুরীপাড়া ও টেকনাফ প্রভৃতি এলাকায় আরাকানী মগদের বসতি আজও বিদ্যমান। উপরের ইতিহাস পর্যালোচনা করে পরিশেষে এ কথা নির্দিষ্ট বলা যায় যে, মুসলমানরা সুদূর অতীতকালেই আরাকানে বসতি স্থাপন করেন।

আরাকানী সমাজে চার শ্রেণির মুসলমানকে দেখা যায়<sup>১৫</sup>। এদের আলোচনার মধ্য দিয়েই আরাকানী সমাজে রোহিঙ্গাদের উদ্ভব ও ইতিহাস চলে আসবে।

### থাম্বইক্যা বা থাম্বুকেয়া

জাহাজ ডুবির আরাকানী প্রতিশব্দ থাম্বইক্যা বা থাম্বুকেয়া। তাই কোনো কোনো ইতিহাসবিদ বলে থাকেন, জাহাজ ডুবির ফলে প্রাণে বেঁচে যাওয়া যেসব মুসলমান আরাকানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন তারাই ‘থাম্বইক্যা’ নামে পরিচিত। এ নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। এরা যে সপ্তম শতকে রাজা মহৎ চন্দ্রের সময় আরবীয় মুসলমানদের জাহাজ ডুবি থেকে আরাকানে এসেছে, এ কথা কেউ কেউ বলার চেষ্টা করলেও, এ তথ্য সঠিক নয়। তারা অন্যকোনো জাহাজ ডুবি থেকেও আরাকানে এসে বসতি স্থাপন করতে পারেন। থাম্বইক্যারা আরাকানী মগদের মতই পোষাক পরিধান করে এবং তাদের ভাষায় কথা বলে। শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসের পার্থক্য ছাড়া আরাকানী মগদের সাথে তাদের আচার-আচরণে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। এ গোত্রের লোকসংখ্যা মাত্র কয়েকশত এবং তারা পেশায় জেলে।

### জেরবাদী

১৪৩০ সালে মিন সুয়া মুন বা নরমিখলার আরাকান পুণরুদ্ধারের সময় বাংলা থেকে যাওয়া সৈন্যদের অনেকেই, মগ মেয়েদের বিয়ে করে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তাদের কেউ কেউ জন্মস্থানে ফিরে আসলেও তৎকালীন আরাকানের নিয়ম অনুসারে স্ত্রী ও সন্তানদের আনতে পারতেন না। ফলে এসব মুসলমান ও আরাকানী মগ মেয়েদের সংমিশ্রণে একটি বর্ণশংকর মুসলিম জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয় এবং এদেরকেই জেরবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আরাকানী মগদের সঙ্গে বেশি পরিমাণে সম্পৃক্ত হবার কারণে জেরবাদী মুসলমানদের বিশ্বাস ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে বৌদ্ধ ও মগদের প্রভাব খুব বেশি।

### কামানচি

মুঘল সুবাদার শাহ সুজার সাথে যারা আরাকানে গিয়েছিল তাদের বংশধরদের কামানচি বলা হয়। ফার্সি কামান শব্দের অর্থ ধনুক। ধনুক ব্যবহারকারী মুসলমান সৈনিকদের কামানচি নামে অভিহিত করা হয়। রাজা সান্দা থু ধম্মা শাহসুজাকে পরিবারসহ হত্যা করলে তার অনুসারীরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেন। রাজা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তাদের সৈন্যবাহিনীতে চাকরি দেন। তারা সৈন্যবাহিনীতে তীরন্দাজ বাহিনী হিসেবে দায়িত্ব পালন করার কারণে এদেরকে ‘কামান বাহিনী’ বা ‘কামানচি’ বলে অভিহিত করা হতো। কামানচি বাহিনী ধীরে ধীরে আরাকান রাজদরবার ও সমাজে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। এমনকি কোন রাজা তাদের অবাধ্য হলে তাকে হত্যা বা পদচ্যুত করে পছন্দমত রাজ পরিবার থেকেই রাজা নির্বাচন করত।

কামানচিরা রাজা থিরি থুরিয়ার (১৬৮৪-৮৫) নিকট বেতন ভাতা বাড়ানোর দাবি করেন। তিনি বেতন বৃদ্ধিতে অপারগতা প্রকাশ করলে, কামানচিরা রাজা থিরি থুরিয়া ও তার পরিবারের সদস্যদেরকে হত্যা করে,

তার ভাই ওয়ারা ধম্মাকে সিংহাসনে বসায়। তিনিও কামানচিদের বেতন ভাতা বাড়ানোর বিষয়ে অপারগতা প্রকাশ করলে কামানচিরা ১৬৯২ সালে প্রাসাদ অবরোধ করেন। রাজা কোনোরকমে পালিয়ে গেলেও কামানচিরা প্রাসাদ পুড়িয়ে দেয়। এভাবে ১৬৮৫ থেকে ১৭১০ সাল পর্যন্ত কামানচিরা তাদের খেয়াল খুশিমত রাজ পরিবারের দশজন লোককে সিংহাসনে বসায় এবং দাবি পূরণ না হলে তাদের পদচ্যুত করে। অবশেষে মহাদভায়ু নামে আরাকানের একজন সামন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সান্দা উইজ্যা নাম ধারণ করে, কামানচিদের বিরুদ্ধে কঠোর দমননীতি পরিচালনা করেন। তিনি কামানচিদের পদচ্যুত করে রামরি, দুলে, লেড়ং, আরাগাঁও, সিক্কেবীন, সিন্দবিন, নদোবিন প্রভৃতি স্থানে নির্বাসিত করে তাদের শক্তি চিরতরে শেষ করে দেন। ধীরে ধীরে এসব স্থানেই কামানচিদের আবাসিক পল্লী গড়ে ওঠে। তারা আকার আকৃতিতে মুঘল কিংবা আফগানদের মতো। এদের সংখ্যা খুব বেশি নেই। ১৯৩১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এদের সংখ্যা পাওয়া যায় ২৬৮৬ জন।

## রোহিঙ্গা

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ভাগ্য বিড়ম্বিত জাতির নাম রোহিঙ্গা। আরাকানের সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর ৯০ শতাংশই রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠীর। রোহিঙ্গাদের উদ্ভব ও ইতিহাস নিয়ে বেশকিছু মত রয়েছে।

প্রথমত, রাজা মহৎ ইঙ্গ চন্দ্রের সময় জাহাজ ডুবির ফলে যে আরব মুসলমান বণিক ও নাবিকরা আরাকানে বসতি স্থাপন করেন, তারাই রোহিঙ্গা এবং আরাকানে আগমনকারী আদি মুসলমান। মহারাজোয়াং এর তথ্যমতে, জাহাজডুবি থেকে উদ্ধার হয়ে তীরে ভিড়ে মুসলিম বণিকরা আরবি ‘রহম’, ‘রহম’ (অর্থ দয়া করা) ধ্বনি উচ্চারণ করে স্থানীয়দের সাহায্য কামনা করেন। যেহেতু আরবীয় বণিকরা সাহায্যের জন্য ‘রহম’ শব্দ উচ্চারণ করেছিল, সেহেতু আরবি ভাষায় অনভিজ্ঞ স্থানীয় লোকজন তাদের রহম গোত্রের লোক মনে করে রহম বলে ডাকত। ক্রমশ শব্দটি বিকৃত হয়ে রহম>রোয়াই>রোয়াইঙ্গা> বা রোহিঙ্গা নামে খ্যাত হয়। রোহিঙ্গা শব্দের উৎপত্তি নিয়ে এ মতকে অনেক ঐতিহাসিক ও ইতিহাস বিশারদ সমর্থন করেছেন।



দ্বিতীয়ত, মিন সুয়া মুন বা নরমিখলা ওরফে সোলায়মান শাহ ১৪৩০ সালে আরাকান পুণর্দখল করে রাজধানী লংগিয়েত থেকে মোহং নামক স্থানে স্থানান্তর করেন। তার সাথে বাংলা থেকে দুপর্বে যাওয়া ৫০ হাজার মুসলিম সৈন্যকে তিনি রাজধানী মোহং ও এর আশপাশেই আবাস্তল গড়ে তোলার অনুমতি দেন। পরবর্তীকালে মোহং শব্দটি মুসলমানদের মুখে এবং লেখায় বিকৃত হয়ে রোহাং বা রোসাঙ্গ হয়েছে এবং এর বাসিন্দারা রোহিঙ্গা নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন। আরাকানের বর্তমান পাথুরিকেল্লা এলাকা রোহিঙ্গাদের কাছে মোহং নামে পরিচিত। মধ্যযুগের কবি আলাওলের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ‘পদ্মাবতী-তে আরাকান বা রাখাইনকে রোসাঙ্গ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অনেকের মতে, রোসাঙ্গ পরবর্তী সময়ে বিকৃত হয়ে রোহিঙ্গা হয়েছে।

তৃতীয়ত, ১৫৮০ থেকে ১৬৬৬ সাল পর্যন্ত পর্তুগিজ ও আরাকানী মগরা পূর্ব বাংলা থেকে মানুষ অপহরণ করে নিয়ে দাস ও শ্রমিক হিসেবে আরাকানে বিক্রি করে দিত। ১৮২৬ সালে ব্রিটিশরা আরাকান দখলের পর সেখানে কৃষিকাজের জন্য বাংলা থেকে হিন্দু, মুসলমান কৃষকদের নিয়ে যাওয়া হতো। এভাবে কিছু লোক সেখানে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলেন। তাই মিয়নামারের বর্মিরা বলার চেষ্টা করেন, বাংলা থেকে যাওয়া এসব মানুষই হলো রোহিঙ্গা।

রোহিঙ্গাদের আগমন ও উদ্ভব সম্পর্কে প্রথম ও দ্বিতীয় মতটিই বেশি গ্রহণযোগ্য। আরবি ‘রহম’ শব্দ থেকে রোহিঙ্গা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলাটাই বেশি যুক্তিযুক্ত। জাহাজ ডুবি থেকে রক্ষার্থে ‘রহম’ ‘রহম’ বলে চিৎকার করা আরব বণিক গোষ্ঠী থান্ডাইক্যা হবার সম্ভাবনা খুবই কম। কেননা বর্তমানে থান্ডাইক্যাগণ নিম্ন শ্রেণির জেলে সম্প্রদায় হিসেবে বসবাস করেছে। সেই সাথে ঈমান আকিদাগত দিক থেকে তারা ইসলামের বিধিবিধান থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেছে। আগেই বলেছি তারা মগদের মতোই জীবন-যাপন করে। সুতরাং আরব বণিক সম্প্রদায়ের সবাই জেলে পেশা গ্রহণ করবে কিংবা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস থেকে দূরে সরে যাবে তা গ্রহণযোগ্য এবং যুক্তিযুক্ত নয়। তাছাড়া চেহারাগত দিক দিয়েও থান্ডাইক্যাদের মধ্যে আরবীয় কোন ছাপ বা মিল পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে রোহিঙ্গাদের ঈমান-আকিদা, জীবন পদ্ধতি এমনকি চেহারাগত দিক থেকে কিছু কিছু লোকের মধ্যে আরবীয় ছাপ স্পষ্ট। এ হিসেবে রোহিঙ্গারা ১৩০০ বছর আগে আরাকানে বসতি স্থাপন করেছে। আবার রাজা মিন সুয়া মুন বা সোলায়মান শাহ প্রতিষ্ঠিত রাজধানী মোহং বিকৃত হয়ে রোসাং বা রোহাং হয়েছে এবং এর বাসিন্দাদের নাম রোহিঙ্গা হয়েছে। এ মতটিও গ্রহণ

করা যেতে পারে। কারণ, রোহিঙ্গা শব্দের উদ্ভবের সঙ্গে স্থানগত ইতিহাসের একটি মিল রয়েছে। এ মতটি ধরলেও সাড়ে ৬শত বছর আগে মুসলমানরা মোহংয়ে বসতি স্থাপন করেছে এবং পরবর্তীকালে রোহিঙ্গা হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। রোহিঙ্গারা বাংলা থেকে অপহৃত ও আরাকানে দাসরূপে ব্যবহৃত জনগোষ্ঠী এবং ব্রিটিশ আমলে শ্রমিক হিসেবে যাওয়া জনগোষ্ঠীর অধস্তন পুরুষ-বিষয়টির সাথে একমত হওয়া যায় না। যদি এরাই রোহিঙ্গা হয়, তবে মিন সুয়া মুন বা নরমিখলা ওরফে সোলায়মান শাহ কর্তৃক আরাকান পুনরুদ্ধার করার সময় বাংলা থেকে দুইবারে প্রেরিত ৫০ হাজার এবং সেসময় আগত ব্যবসায়ীগণ ও সৈন্যদের আত্মীয়-পরিজন কোথায় গেলেন? সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী ও তৎপরবর্তী সময়ে আরাকানে বসতি স্থাপন করা আরবিয় ও অন্যান্য মুসলমান এবং স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ কোথায় গেলেন? বাংলা থেকে অপহৃত মানুষ এবং ব্রিটিশ আমলে শ্রমিক বা চাকরি করতে যাওয়া মুসলমানদের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের হয়তো বিস্তৃতি ঘটেছে; কিন্তু তাদের মাধ্যমে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছে, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আরবি রহম শব্দ থেকে অথবা মোহংয়ের অধিবাসী হবার কারণে আরাকানের মুসলমানদেরকে রোহিঙ্গা বলা হয়ে থাকে। অতএব, আরব, বণিক, নাবিক, ইসলাম প্রচারক, গৌড়ীয় মুসলিম সৈন্য, আফগান, ইরানী, বাংলা থেকে অপহৃত মুসলমানগণ এবং তাদের সাথে স্থানীয় মগ নারীদের বিবাহের ফলে জন্ম নেয়া সন্তান, ধর্মান্তরিত মুসলমান সবাই কালক্রমে রোহিঙ্গা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। অর্থাৎ ইতিহাসের পরিক্রমায় আরাকানে থাকা সব মুসলমান এখন এককভাবে রোহিঙ্গা হিসেবে পরিচিত। যেমন, শাহসুজার অনুসারী ও সৈন্য সামন্তদের প্রজন্ম কামানচি মুসলমানরাও পরবর্তী কালে রোহিঙ্গা হিসেবেই পরিচিত হয়ে ওঠে<sup>১৬</sup>। আধুনিক কালের প্রয়োগ হলেও বাঙ্গালির ইতিহাস যেমন হাজার বছরের তেমনি রোহিঙ্গা শব্দটির উৎপত্তিও যেভাবেই হোক, তাদের ইতিহাস হাজার বছরের চেয়েও পুরোনো। তারা পরিচয়হীনভাবে বেড়ে ওঠা কোনো জাতিগোষ্ঠী নয়। মূলত রোহিঙ্গারাই আরাকানের স্থায়ী ও আদি মুসলমান।

আরাকানের আকিয়াব (সিটওয়ে), রাখিডং, বুখিডং, মংডু, কিয়ঙ্কাও, মাস্ত্রা, পাথুরিকেল্লা, কায়ুকপাউ, পুন্যাগুন ও পায়ুকতাউ এলাকায় রোহিঙ্গা মুসলমানরা বসবাস করেন। এছাড়া মিনবিয়া, মাইবন ও আন এলাকাতেও অন্যদের সাথে রোহিঙ্গারা বাস করেন। বর্তমানে রোহিঙ্গাদের প্রায় সবাইকে বাংলাদেশে তাড়িয়ে দিয়েছে মিয়ানমার সরকার ও সেনাবাহিনী।

এখন শুধুমাত্র আরাকানের রাজধানী আকিয়াব (সিটওয়ে) এর আশপাশে সরকার নির্মিত কিছু ক্যাম্পে রোহিঙ্গারা প্রায় বন্দি অবস্থায় রয়েছে<sup>১৭</sup>। কারণ, তাদের ক্যাম্পের বাইরে যাবার অনুমতি নেই। ২০১৭ সালের অভিযানে বিতাড়িতসহ বর্তমানে সাড়ে ১১ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে উদ্বাস্তু জীবন-যাপন করছে। এছাড়া সৌদি আরবে ৩ লাখ, পাকিস্তানে ৩ লাখ ৫০ হাজার, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ১০ হাজার, ভারতে ৪০ হাজার, মালয়েশিয়ায় ১ লাখ ৫০ হাজার, ইন্দোনেশিয়ায় ১ হাজার ও থাইল্যান্ডে ৫ হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী হিসেবে বাস করছে<sup>১৮</sup>।

মিয়ানমার ও আরাকানের রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং সামাজিক জীবনে মুসলমান ও রোহিঙ্গারা সপ্তম শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে আরাকান ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলিম বণিকরা বাণিজ্য মিশন নিয়ে যাতায়াত শুরু করলেও অষ্টম শতাব্দীতে তাদের আগমন বেড়ে যায়। দশম শতাব্দীতে চট্টগ্রাম ও এর আশপাশের অঞ্চলে মুসলিম সমাজের প্রভাব এতটা বেড়ে গিয়েছিল যে, কোনো কোনো ঐতিহাসিক বা গবেষক একে ছোটখাটো মুসলিম রাজ্য হিসেবে চিহ্নিত করে এর আমিরকে সুলতান বলে আখ্যা দিয়েছেন<sup>১৯</sup>। এর ঢেউ আরাকানী সমাজ ব্যবস্থায়ও লেগেছিল। আরাকানে আগত ও বসতি স্থাপনকারী আরব বণিক সম্প্রদায়, নাবিক, সুফি, দরবেশ শ্রেণি এবং ত্রয়োদশ শতকের পর থেকে তুর্কি, পাঠান ও মুঘলদের শাসনামলে বাংলা থেকে আগত মুসলমানদের সঙ্গে এ অঞ্চলের নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধদের সংমিশ্রণ ঘটে এবং তারা ব্যাপকভাবে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

মুসলমানদের জীবন ও সংস্কৃতি আরাকানের জনজীবন ও ইতিহাসে গভীর প্রভাব ফেলে। ফলে, আরাকান ও চট্টগ্রামে একটি ইসলামি পরিবেশ সম্বলিত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। আরাকানীদের পর্দা প্রথা, খাদ্যাভাস, রান্না পদ্ধতি, এমনকি মানবীয় আচরণেও ইসলামের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এমনকি মুসলমান নারীদের পর্দা পালনের প্রভাব আরাকানের অমুসলিম নারীদের মাঝেও বিস্তার লাভ করে। চট্টগ্রাম-আরাকানের বিভিন্ন স্থানের আরবি নাম, খেলাধুলা, রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারে আরবীয় প্রভাব এমনকি কথাবার্তায় আরবি ভাষার অনুকরণে ‘লা’ (আরবি লা অর্থ না, না বোধক শব্দ বাক্যের শুরুতে ‘আই ন যাইয়ুম’) ব্যবহার সুস্পষ্টভাবে আরব প্রভাবের ফল, এতে কোনো সন্দেহ নেই<sup>২০</sup>। এভাবে আরাকানের সামাজিক অবকাঠামোগত ভিত্তিতে ইসলামের সম্পৃক্ততা দ্রুত বেড়ে যায়।

প্রাচীন কাল থেকেই আরাকানের রাজনীতি ও প্রশাসনে মুসলমান এবং রোহিঙ্গাদের অংশগ্রহণ ছিল। ১০৫৭ সালে আরাকান দখলকারী প্রাচীন বার্মার সবচেয়ে শক্তিশালী পুঁগা

সাম্রাজ্যের রাজা আনাওয়ারাথার দরবারেও মুসলমানদের উপস্থিতি ছিল<sup>২১</sup>। তার সন্তানের গৃহশিক্ষক হিসেবে জনৈক মুসলিম ব্যক্তিকে নিয়োগ দেন। আনাওয়ারাথার মৃত্যুর পর তার পুত্র সাউলু ১০৭৭ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর শৈশব কালের গৃহশিক্ষকের পুত্র, দুধভাই ও বাল্যবন্ধু আবদুর রহমান খানকে (বর্মি ভাষায় ইয়ামানকান) বন্ধুত্বপ্রীতির নিদর্শন স্বরূপ উসসা নগরীর (বর্তমানে পেগু) শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু পরবর্তীতে দুবন্ধুর মাঝে ভুল বোঝাবুঝির কারণে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সাউলুর বিরুদ্ধে আবদুর রহমান বিজয়ী হলেও সাউলুর অন্য ভাই কানজিথার ষড়যন্ত্রে তিনি নিহত হন। ফলে বার্মা তথা আরাকান অঞ্চলে মুসলিম প্রভাবের উষালগ্নেই সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়।

আরাকানের রাজনীতি ও প্রশাসনে ইসলামি প্রভাবের মূলধারা শুরু হয় মিন সুয়া মুন বা নরমিখলার রাজত্বকালে<sup>২২</sup>। মিন সুয়া মুন আরাকান থেকে বিতাড়িত হয়ে দীর্ঘ ২৪ বছর বাংলায় অবস্থান করেন। এসময় তিনি মুসলিম রীতিনীতি ও সভ্যতার প্রতি প্রচণ্ড ও গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। ১৪৩০ সালে বাংলার সুলতানের সহায়তায় পিতৃরাজ্য আরাকান পুনরুদ্ধারের পর তিনি সেখানে মুসলিম ভাবধারার শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন, যার রেশ পরবর্তী রাজাদের আমলেও দেখা যায়। সোলায়মান শাহ (ইসলামি নাম) নাম ধারণের পাশাপাশি মিন সুয়া মুন রাজদরবারে মদপানসহ সব অনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ম্রাউক উ রাজবংশ ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত আরাকান শাসন করেন। একদা আরাকান থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন বিধায় তিনি মগদের তেমন বিশ্বাস করতেন না। সে কারণে বাংলা তথা গৌড় থেকে দুইবারে যাওয়া প্রায় ৫০ হাজার সৈন্যকে তিনি রাজকীয় সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেন। সৈন্যবাহিনীসহ সরকারি বড় বড় পদে মুসলমানদের আধিপত্য গড়ে ওঠে। মুসলমানদের নামাজ আদায়ের জন্য সোলায়মান শাহ শ্রোহংয়ে একটি মসজিদ নির্মাণ করে দেন; পরবর্তীকালে এটি সিন্ধিখানের মসজিদ নামে খ্যাতি লাভ করে। ফার্সিকে সরকারি ভাষা হিসেবে চালু করেন মিন সুয়া মুন বা সোলায়মান শাহ যা পরবর্তী ম্রাউক রাজাদের সময়ও থেকে যায়। গৌড়রাজের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ম্রাউক রাজারা নিজেদের আরাকানী নামের সাথে একটি মুসলিম নাম ব্যবহার করতেন। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, রাজারা শুধু মুসলিম নামই নয়, তারা ইসলাম ধর্মও কবুল করেন। যেমন : মিন সুয়া মুন হন মুহাম্মদ সোলায়মান শাহ, খামাউংগা নাম নেন হোসেন শাহ, মিনবিন হন জবৌক শাহ, থিরি থু ধম্মা নাম নেন সেলিম শাহ ইত্যাদি। ১৪৩০ থেকে প্রায় দুশো বছর পর্যন্ত ১৮ জন ম্রাউক রাজাদের মুসলিম নাম ধারণের ইতিহাস পাওয়া যায়। ম্রাউক রাজারা গৌড়ের মুসলমান রাজের আদলে মুদ্রা চালু করেন। মুদ্রার একপিঠে

ফার্সি ভাষায় রাজার মুসলিম নাম ও অভিষেক কাল এবং অপরপিঠে কালেমা শরিফ লেখা থাকত। এসব মুদ্রা গোড়ের মুসলিম শাসকদের মুদ্রার অনুরূপ মুদ্রিত, যা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এখনো সংরক্ষিত আছে। ম্রাউক রাজাদের আমলে আরাকানে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এমনকি ম্রাউক রাজারা সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে বিশেষজ্ঞ আলেমের কাছে ১০ বছর কুরআন-হাদিস শিক্ষা গ্রহণ করতেন বলেও কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। আরাকানের রাষ্ট্রীয় ভাষা ফার্সি ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ আরাকান ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসার পরও ২২ বছর পর্যন্ত চালু ছিল।

মধ্যযুগে আরাকান রাজদরবারে মুসলিম প্রভাব ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। রাজসভার বড় বড় পদে মুসলমানরা নিযুক্তি লাভ করেন। এসময় রাজারা মুসলমানদের মহামাত্য (প্রধানমন্ত্রী), লস্কর উজির (যুদ্ধমন্ত্রী), কাজি, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী পদে নিয়োগ দান করেছিলেন<sup>২৩</sup>। ‘নসবনামা’ ও ‘শরীয়তনামা’ কাব্যগ্রন্থের কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের বংশধর বুরহান উদ্দিন, ইবরাহিম, সুজা উদ্দিন, শেখ রাজা, কাজি ইসহাক, শরীফ মনসুর খোন্দকার প্রমুখ ব্যক্তিরা ১৪৯১ থেকে ১৫৭৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময় আরাকান রাজের লস্কর উজিরসহ নানা পদে নিযুক্ত ছিলেন।

আরাকান রাজসভার প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন আশরাফ খান। তিনি চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার অন্তর্গত চারিয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ওই গ্রামে তার বিশাল পাকা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান। আশরাফ খান আরাকানের তৎকালীন অধিপতি থিরি থু ধম্মা ওরফে সেলিম শাহ দ্বিতীয় (১৬২২-১৬৩৮ সাল)-এর লস্কর উজির বা যুদ্ধমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আশরাফ খানের পৃষ্ঠপোষকতায় আরাকান রাজ দরবারে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রতিভাবান কবি দৌলত কাজি তাঁর কাব্য প্রতিভা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। ‘সতী ময়না’ ও ‘লোর চন্দ্রানী’ কাব্যের রচয়িতা দৌলত কাজি আরাকান রাজসভায় বিশিষ্ট স্থান দখল করেছিলেন। মূলত আশরাফ খান রাজা থিরি থু ধম্মার রাজদরবারে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সৈনিক বিভাগ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে রাজা আশরাফ খানের পরামর্শ নিতেন।

আরাকান রাজের সমরমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আশরাফ খান যেমন রাজ্যের উন্নতি ও শৃঙ্খলা বিধানে ব্যাপক প্রশংসনীয় অবদান রাখেন, তেমনি আরাকানে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ওই সময় সরকার থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীতেও মুসলমানদের অন্তর্ভুক্তি ছিল অন্য সময়ের তুলনায় বেশি।

আশরাফ খানের পরে মুসলমানদের মধ্য থেকে লস্কর উজির বা সমরমন্ত্রী হন বড় ঠাকুর। তিনি আরাকান রাজ নরপদিগীর (১৬৩৮-১৬৪৫) শাসনামলে এ গুরু দায়িত্ব পালন করেন। তিনি চট্টগ্রামের পটিয়া থানার চক্রশালা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। মহাকবি আলাওল তার ‘সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামান’ কাব্যগ্রন্থে উল্লেখ করেন-

রাজ্যপাল সৈন্যমন্ত্রী আছিলেন তাত / শ্রী বড় ঠাকুর নাম জগৎ বিখ্যাত।

কোরেশী মাগন ঠাকুরও আরাকান রাজ নরপদিগীর শাসনামলে রাজ সভার মন্ত্রী ছিলেন। ১৬৪৫ সালে মারা যাবার পূর্বে নরপদিগীর তার একমাত্র কন্যাকে অভিভাবকহীন না রেখে কোরেশী মাগন ঠাকুরের অভিভাবকত্বে দিয়ে যান। কবি আলাওল সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামান কাব্যে উল্লেখ করেন-

তান অমাত্য শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত মাগন/ শিশুকালে বৃদ্ধ রাজা কৈলা সমর্পণ।

নানা গুণ পারগ মোহন্ত কুলশীল / তাহাকে আনিয়া নৃপ কন্যা সমর্পিল।

কোরেশী মাগন ঠাকুর খোদা ভিরু ও চরিত্রবান মুসলমান ছিলেন। এজন্য রাজা তার কন্যাকে মাগন ঠাকুরের অভিভাবকত্বে দিয়েছিলেন। রাজা নরপদিগীর মৃত্যুর পর তার ভ্রাতুষ্পুত্র থদো মিস্তারের সাথে নরপদিগীর কন্যার বিয়ে দিয়ে থদো মিস্তারকে সিংহাসনে বসান মাগন ঠাকুর। ১৬৫২ সালে থদো মিস্তারের আকস্মিক মৃত্যু হলে আবারও ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন মাগন ঠাকুর। তিনি রানীর অভিভাবকত্বে থদোর শিশু পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে মহাপাত্র বা প্রধানমন্ত্রী হন। এসময় মূলত আরাকানের প্রসাশনের তিনিই মূল ব্যক্তি ছিলেন। কোরেশী মাগন ঠাকুর একাধারে ২০ বছর (১৬৩৮-১৬৫৮ সাল) পর্যন্ত আরাকানের রাজদরবারে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বহুভাষাবিদ ও সাহিত্যিকও ছিলেন। প্রশাসনিক কাজের পাশাপাশি তিনি ‘চন্দ্রাবতী’ কাব্য রচনা করেন। মাগনের ভাই ভিকনও রাজসভার কর্মচারী ছিলেন। ভিকনও সাহিত্য চর্চা করতেন। তাঁর রচিত ‘রাধাকৃষ্ণ’ পদাবলী পাওয়া যায়।

আরাকান রাজা সান্দা থু ধম্মার শাসনামলে (১৬৫২-১৬৮৪ সাল) ১৬৫৯ সালে মহামাত্য বা প্রধানমন্ত্রী মাগন ঠাকুর মৃত্যুবরণ করলে শ্রীমন্ত সোলায়মান আরাকানের মহামাত্য বা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। দেশের রাজকোষ এবং সাধারণ শাসনের ভার ন্যস্ত ছিল তাঁর ওপর। আরাকানের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণসহ ইসলামি সংস্কৃতি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন সোলায়মান। তিনি পরোপকারী ও উদার অমাত্য ছিলেন। সান্দা থু ধম্মার শাসনামলে আরও কয়েকজন মুসলিম অমাত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

সৈয়দ মুহাম্মদ খান, নবরাজ মজলিশ, সৈয়দ মুসা প্রমুখ। সৈয়দ মুসার পৃষ্ঠপোষকতায় কবি আলাওল ‘সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান’র অবশিষ্টাংশ রচনা করেন। এতে শাহজাদা সুজার আরাকান আগমন ও আরাকান রাজা কর্তৃক হত্যাকাণ্ডের ঘটনার বিবরণ আছে। এ থেকে অনুমান করা হয় যে, এ কাব্যটি ১৬৬৯ সালের দিকে রচিত। সৈয়দ মুসার মৃত্যুর পর সান্দা থু ধম্মার পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হন নবরাজ মজলিশ। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে কবি আলাওল ‘সিকান্দার নামা’ কাব্যটি ১৬৭৩ সালে রচনা করেন। নবরাজ মজলিশ ইসলামের একজন একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তিনি মুসলমানদের ইবাদত বন্দেগীর জন্য বেশ কয়েকটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

মহাকবি আলাওলের সুবাদে সপ্তদশ শতাব্দীর কিছু সংখ্যক মুসলিম অমাত্যের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। শুধুমাত্র সান্দা থু ধম্মার শাসনামলের ৩২ বছরে (১৬৫২-১৬৮৪ সাল) পাঁচজন অমাত্যের বিবরণ পাওয়া গেছে, যারা কবি সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে সাহিত্য চর্চা করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তাহলে যারা সাহিত্য চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা দান করেননি এমন মুসলিম অমাত্যের সংখ্যা আরও অনেক হবে। বড় পদে থাকা ব্যক্তিরাই কেবল এ ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা দিতে পারেন, তাই কাব্য বা সাহিত্যে তাদের নাম এসেছে। কিন্তু এছাড়াও আরাকান রাজদরবারের অন্যান্য পদে মুসলিমদের বিচরণ ছিল বলে ধারণা করা যায়।

শুধু অমাত্য বর্গই নয়, আরাকানের বিচার ব্যবস্থাতেও মুসলমানদের অংশগ্রহণ ছিল<sup>২৪</sup>। মিন সুয়া মুন বা সোলায়মান শাহ ১৪৩০ সালে আরাকান পুণরুদ্ধারের পর মুসলিম রীতিতে বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি বিচার কাজ পরিচালনার জন্য মুসলমানদের মতো কাজি নিয়োগ করেন। কবি দৌলত কাজি আরাকানের বিচারকের পদেও ছিলেন। অনুরূপভাবে কাজি সৈয়দ মসউদ শাহও আরাকানের কাজি ছিলেন। কবি আলাওলের ভাষায়-

সৈয়দ মসউদ শাহা রোসাঙ্গের কাজি / জ্ঞান অল্প আছে বলি মোরে হৈল রাজি ।।

পরবর্তীকালে সুজা কাজি, গাওয়া কাজি, নালা কাজি, কাজি আবদুল করিম, কাজি মুহাম্মদ হোসেন, কাজি ওসমান, কাজি আবদুল জব্বার, কাজি আবদুল গফুর, কাজি মোহাম্মদ ইউসুফ, কাজি নুর মোহাম্মদ, কাজি রওশন আলী প্রমুখের নাম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সুজা কাজি ম্রাউক উ সাম্রাজ্যের শেষ পর্বে ১৭৮৪ সালে আরাকানের বিচারক ছিলেন। এ সময় বোধপায়া আরাকান দখল করলে তিনি তার পক্ষ নেন। বোধপায়ার আমলে তাঁকে দক্ষিণ আরাকানের আচিরাং (বিচারক বা কাজি) হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। আরাকানের সাদা পাড়ায় সুজা কাজির পাকা মসজিদ ও পাকা ঘাট সম্বলিত দিঘীর ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। মসজিদের নিকট তাঁর কবরও রয়েছে।



আরাকানী রাজদরবারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের রচনায় মধ্যযুগে বাংলা ও আরাকানী সাহিত্যের বিকাশ ঘটে<sup>২৫</sup>। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল আরাকান রাজদরবারে তার সাহিত্য প্রতিভার সাক্ষর রাখেন। আরাকান রাজা ও মন্ত্রীদেব পৃষ্ঠপোষকতায় মহাকবি আলাওল হিন্দি কবি মালিক মুহাম্মদ জায়সীর কাব্য অনুসরণে রচনা করেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘পদ্মাবতী’। এছাড়াও জঙ্গনামা, তোহফা, সিকান্দারনামাসহ বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন তিনি। আরাকানী সাহিত্য চর্চায় কোরেশী মাগন ঠাকুর, কবি মরদন ও দৌলত কাজির নাম উল্লেখযোগ্য, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আলাওল ও দৌলত কাজি তাদের গ্রন্থে আরাকানকে রোসাঙ্গ রাজ্য হিসেবে উল্লেখ করেন। কবি আবদুল করিম খোন্দকার ১৭৪৫ সালে আরাকানের রাজ কোষাধ্যক্ষ আতিবর নামক জনৈক ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় ‘দুল্লাহ মজলিশ’ কাব্য রচনা করেন। সে সময় আরাকানের রাজা ছিলেন নরাপায়া (১৭৪২-১৭৬১ সাল)। এই কাব্যে কবি আত্মকথার পাশাপাশি আরাকানের বন্দর, নদী, ঘাট প্রভৃতির বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়া আরাকানের কাজি, মুফতি, দরবেশ, ফকিরসহ জ্ঞানী-গুণী মুসলমানদের বসবাস ও জীবনযাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন। আরাকানের সরদার পাড়ার কবি আবদুল করিমের রোসাঙ্গ পাঞ্চগালা; মোহংয়ের কবি আবুল ফজলের আদমের লড়াই; আরাকানের কাইমের অধিবাসী কাজি আবদুল করিমের রাহাতুল কুলুব, আব্দুল্লাহর হাজার সওয়াল, নুরনামা, মধুমালতী, দরীয়ে মজলিশ; কাইমের অধিবাসী ইসমাইল সাকেব এর বিলকিসনামা; কাজি মোহাম্মদ হোসেন এর আমির হামজা, দেওলাল মহি ও হায়দারজঙ্গ আরাকানের অন্যতম কবি ও কাব্য গ্রন্থ। এসব কবিদের কাব্যগ্রন্থ আরাকানের ইতিহাস এবং আরাকানী সমাজে মুসলমানদের অবদানের সাক্ষর বয়ে চলেছে।

### মিয়ানমার ও আরাকানের রাজনীতিতে মুসলমান ও রোহিঙ্গা

ব্রিটিশ আমলে স্বাধীনতার দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন এবং ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীকালেও মুসলমান ও রোহিঙ্গারা মিয়ানমার এবং আরাকানের রাজনীতি ও সমাজ জীবনে অবদান রেখেছেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় সু চির বাবা জেনারেল অং সানের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক সহযোগী ছিলেন আবদুল রাজ্জাক নামে একজন মুসলমান<sup>২৬</sup>। আবদুল রাজ্জাক তৎকালীন বার্মা মুসলিম লিগের সভাপতি ছিলেন। মিয়ানমারের স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী জেনারেল অং সানের গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভার শিক্ষা ও পরিকল্পনামন্ত্রী ছিলেন তিনি। ১৯৪৭ সালের ১৯ জুলাই জেনারেল অং সানের সঙ্গে খুন হওয়া ছয়জন মন্ত্রীর মধ্যে

তিনিও ছিলেন। কেবল আবদুল রাজ্জাকই নন, সু চির বাবা জেনারেল অং সানের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগীদের মধ্যে আরও অনেক মুসলমান ছিলেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় মিয়ানমারের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রভূমি ছিল রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়।

সে সময় রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করত অল বার্মা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন আর রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ-আরইউএসইউ। অং সান রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন ১৯৩৩ সালে। আরইউএসইউ প্রতিষ্ঠার বছরই (১৯৩০) তাতে সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এম এ রাশিদ। ধীরে ধীরে অং সানের প্রধান রাজনৈতিক সহযোদ্ধা হয়ে ওঠেন এম এ রাশিদ ও উ নু। অং সান আরইউএসইউতে ১৯৩৬ সালে ভাইস প্রেসিডেন্ট আর এম এ রাশিদ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই নেতারা বার্মার স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রপুরুষ। অথচ এই অসাম্প্রদায়িক গৌরবের অতীত আজ মুছে ফেলতে চায় দেশটির নেত্রী সু চি ও সেনাপ্রধান মিন অংহ্লাইং। রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাশিদ, অং সান এবং উ নু ছিলেন তিন প্রাণের বন্ধু। ১৯৩৬ সালের মে মাসে রেঙ্গুনের জুবলি হলে এক ছাত্র সম্মেলনের মাধ্যমে অল বার্মা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন-এবিএসইউ গড়ে তুলেছিলেন তারা। রাশিদ ছিলেন এবিএসইউর প্রথম সভাপতি। এম এ রাশিদই মিয়ানমারের ইতিহাসে একমাত্র ছাত্রনেতা, যিনি একই সময় এবিএসইউ এবং আরইউএসইউ- উভয় সংগঠনের সভাপতি ছিলেন। এর কিছুদিন পরই জওহরলাল নেহরু মিয়ানমারে এসেছিলেন এবং তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য, ছাত্ররা যে কমিটি করে, অং সানের প্রস্তাব মতো তাতে সাধারণ সম্পাদক ছিলেন রাশিদ। অং সানের অস্বাভাবিক মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এই তিনজনের রাজনৈতিক বন্ধুত্ব বজায় ছিল। অং সান-রাশিদ-উ নু-রাজ্জাক প্রমুখের বন্ধুত্ব স্বাধীনতার উষালগ্নে মিয়ানমারে যে ঐক্য তৈরি করেছিল, তার ভিত্তিতেই ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারিতে শান স্টেটের পাংলংয়ে ঐতিহাসিক জাতি-সম্মেলন আহূত হয়েছিল। সেখানে অং সান বলেছিলেন, মিয়ানমার হবে সব জাতির একটি ‘ইউনিয়ন’। যেখানে ‘বর্মণরা এক কায়েত পেলে অন্যরাও এক কায়েত পাবে।’ এই ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতির ওপর দাঁড়িয়েই সেদিন কাচিন-কারেন-শান-মুসলমান সবাই বার্মা ইউনিয়নে যোগ দিয়েছিল। অথচ আজ সেই অং সানের কন্যা সু চি মিয়ানমারে মুসলমান রোহিঙ্গাদের অস্তিত্বই অস্বীকার করছেন।

১৯৪৭ সালে মিয়ানমারের সংবিধানের অন্যতম খসড়াকারী ছিলেন রাশিদ। পরবর্তীকালে তিনি স্বাধীন মিয়ানমারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী উ নু’র মন্ত্রিসভায় শ্রমমন্ত্রী হন। আকিয়াবের এমপি সুলতান মাহমুদ উ নুর নেতৃত্বে গঠিত ১৯৬০-এর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন।

এছাড়াও উ নু'র মন্ত্রীসভায় খনিজ মন্ত্রী ছিলেন উ খিন মং লাট, শিল্পমন্ত্রী ছিলেন উ রশীদ। মালয় ফেডারেশন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে বার্মার রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন মুসলিম উ পে খিন। এসব মুসলমান মন্ত্রী ও রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমে উ নু সরকার মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করেন। কিন্তু ১৯৬২ সালে নে উইন ক্ষমতা দখলের পর থেকে দেশটিতে বৌদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার শুরু হয়। মুসলমানদের আর মন্ত্রী কিংবা বড় কোনো পদে বসাননি তিনি। ১৯৪৮ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সুলতান মাহমুদ, আবুল বাশার, আবদুল গাফ্ফার, জোহরা বেগম প্রমুখ রোহিঙ্গা মুসলিমরা আরাকানের বিভিন্ন এলাকা থেকে এমপি নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, বছরের পর বছর মন্ত্রীও হয়েছিলেন। এমনকি ১৯৯০-এ সামরিক বাহিনীর অধীনে পরিচালিত নির্বাচনে (যে নির্বাচনে অং সান সু চির দল নির্বাচিত হয়েও সরকার গঠন করতে পারেনি) শামসুল আনোয়ার (বুথিডং-১), মো. নুর আহমেদ (বুথিডং-২), উ চিট লুইং (ইব্রাহিম, মংডু-১), ফজল আহমেদ (মংডু-২) প্রমুখ রোহিঙ্গারা উত্তর আরাকান থেকে পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তখন আরাকানের রোহিঙ্গারা (আটটি আসনে) নিজস্ব রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস পার্টি থেকেই প্রার্থী হতে অনুমতি পেয়েছিলেন। ১৯৯০-এর নির্বাচনে বিজয়ী এমপি শামসুল আনোয়ারকে অং সান সু চি ১৯৯৮ সালে রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধি হিসেবে 'পিপলস পার্লামেন্ট'-এ যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানান এবং শুধু এই ডাকে সাড়া দেয়ার কারণে তাঁর ৪৭ বছরের জেল হয়েছিল। এমনকি শামসুল আনোয়ারের পুত্র-কন্যাদেরও ১৭ বছর করে সাজা দেয় তৎকালীন জাঙ্গা সরকার। মিয়ানমারের মুসলমান নেতৃত্বকে মুছে দেয়ার প্রক্রিয়ায় ২০১৭ সালের ২৯ জানুয়ারি হত্যা করা হয় সু চির আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার উ কোনিকে। সন্তানদের বিদেশি নাগরিকত্ব থাকার অজুহাতে সামরিক জাঙ্গা যখন সু চির প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণে বাধা তৈরি করে, তখন সংবিধানের ভেতরই বিকল্প সরকার প্রধান হিসেবে সু চির জন্য 'স্টেট কাউন্সিলর' পদ সৃষ্টির পথ দেখিয়ে দেন তিনি। সামরিক বাহিনীর সমালোচনা এবং রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়া ১৯৮২ সালের আইনের সমালোচনা করাই হয়তো ছিল তাঁর অপরাধ। সাবেক এক সেনা গোয়েন্দা কর্মকর্তার নির্দেশে গুলি করে তাঁকে হত্যার মধ্যে দিয়ে মিয়ানমারের জাতীয় রাজনীতিতে মুসলমানদের মুছে ফেলা হয়। সু চি এই হত্যাকাণ্ডকে সন্ত্রাসী কাজ বলে কো নি-কে শহীদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। অথচ এখন তিনি মিয়ানমারের মুসলমান ও আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমানদের দীর্ঘদিনের অবদান ভুলে তাদের নিজ জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত করার জঘন্য খেলায় সেনাপ্রধান মিন অং হ্লাইয়ের সাথে হাত মিলিয়েছেন।

## আরাকানে মগ বা রাখাইন ও বৌদ্ধবাদের আগমন

বিভিন্ন সময় রোহিঙ্গা মুসলমানদের তাড়িয়ে দেয়ায় বর্তমানে আরাকানে মগ বা রাখাইন সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রাচীন বার্মার রাজা-রাজরাদের কাহিনী সংকলন মহারাজোয়াং এর তথ্যমতে, প্রাচীন ভারতের মগধ থেকে (ভারতের বিহারের পাটনা ও গয়া জেলার মিলিত ভূ-ভাগকে মগধ বলা হতো।) খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে ১৪৬ কিংবা ১৫১ খ্রিষ্টাব্দে সামন্ত রাজ চন্দ্রসূর্য একদল সৈন্যসামন্ত ও অনুসারীদের নিয়ে মারুবংশের পতন ঘটিয়ে আরাকান ও চট্টগ্রাম দখল করেন<sup>২৭</sup>। রাজা চন্দ্রসূর্য হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এ কারণে তার অনুসারীদের মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু দুই ধর্মের লোকই ছিল। রাজা চন্দ্রসূর্য রাজধানী ধন্যাবতীতে প্যাগোডা নির্মাণ করে তথায় সর্বপ্রথম মহামুনি বুদ্ধমূর্তি তৈরি করে স্থাপন করেন।

খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত চন্দ্রসূর্য বংশ চট্টগ্রাম-আরাকান শাসন করেন। চন্দ্রসূর্য বংশের আমলে চট্টগ্রাম এলাকায় হিন্দু ধর্ম এবং আরাকান এলাকায় বৌদ্ধ ধর্ম বিকাশ লাভ করে। এই রাজবংশের রাজা ছান্দা থুরিয়া আরাকানের সমাজে বৌদ্ধ ধর্মমত বিকাশ ও বিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। রাজার পৃষ্ঠপোষকতার কারণে স্থানীয়রাও ব্যাপকভাবে বৌদ্ধ ধর্মে দিক্ষিত হন। প্রাচীন ভারতের মগধ থেকে আরাকানে আসা এই জনগোষ্ঠীই ইতিহাসে মগ নামে পরিচিত<sup>২৮</sup>। পরবর্তীকালে আরাকানের মুসলমানরা যেমন এককভাবে রোহিঙ্গা নামে পরিচিতি পায়, তেমনি সেখানকার বৌদ্ধবাদীরাও এককভাবে মগ নামে পরিচিতি পায়। আরাকানের বৌদ্ধধর্মী মগরা যে প্রাচীন ভারতের মগধ থেকে গিয়েছেন, তার সত্যতা মধ্যযুগের প্রভাবশালী কবি কাজি দৌলতের কবিতাংশেও পাওয়া যায়<sup>২৯</sup>। তিনি লিখেছেন-

কর্ণফুলী নদী পূর্বে আছে একপুরী  
রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতারাী ।।  
তাহাতে মগধ বংশ ক্রমে বুদ্ধাচার  
নাম শ্রী সু ধর্মা রাজা ধর্ম অবতার ।।

কবি রাজাকে মগধের বংশ বলে উল্লেখ করেছেন এবং ক্রমে বুদ্ধাচার দ্বারা বুঝিয়েছেন তারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন। মগ শব্দটি মগধ থেকেই এসেছে। যা মগধ থেকে আসা বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও তার মাধ্যমে বিস্তার লাভ করা জনগোষ্ঠীর পরিচয় জ্ঞাপক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মধ্যযুগেও মগরা মগ নামেই পরিচিত ছিল, রাখাইন নয়।

কিন্তু মগরা বর্তমানে নিজেদের ‘মগ’ নাম পাল্টিয়ে ‘রাখাইন’ রেখেছে। তারা নিজেদের এখন আর মগ বলে পরিচয় দিতে চান না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন তারা এই মগ নাম পরিহার করেছে?

প্রকৃত ঘটনা হলো, ১৬৬৬ সালে মুঘল সুবাদার শায়েস্তা খান কর্তৃক চট্টগ্রাম দখল না হওয়া পর্যন্ত মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুরা পূর্ব বাংলার মেঘনা নদীর মোহনা থেকে শুরু করে পশ্চিম বঙ্গের মর্শিদাবাদ পর্যন্ত এলাকায় লুটতরাজ, ডাকাতি, লুণ্ঠণ, ধর্ষণ, অপহরণসহ নানা অপকর্ম করত<sup>৩০</sup>। এই অপকর্ম আড়াল করতেই তারা আর নিজেদের ‘মগ’ বলে পরিচয় দিতে চান না। পর্তুগিজরা নৌবিদ্যা ও নৌযুদ্ধে পারদর্শী ছিল। তাদের মাধ্যমে তৎকালীন আরাকান রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত চট্টগ্রাম এলাকা রক্ষা করা যাবে ভেবে আরাকান রাজ মিনবিন বা জৌবক শাহ (১৫৩১-১৫৫৩ খ্রিষ্টাব্দ) পর্তুগিজদের চট্টগ্রামে বাণিজ্য ও বসতি গড়ার অনুমতি দেন। অল্পদিনের মধ্যেই পর্তুগিজরা স্বরূপ উন্মোচন করে দক্ষিণ ও পূর্ববাংলার সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ডাকাতি, দস্যুতা ও মানুষ অপহরণের মাধ্যমে দাস ব্যবসা শুরু করে। পর্তুগিজ জলদস্যুদের সফলতায় আরাকানের বৌদ্ধ মগরাও তাদের সাথে যোগ দিয়ে জলদস্যুতায় নেমে পড়ে। মগরা পর্তুগিজদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার শিখে। এরপর পর্তুগিজ ও মগরা মিলে বাংলার পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমাঞ্চলের নদীপথে জলদস্যুতা শুরু করে। পর্তুগিজরা চট্টগ্রামে গড়ে তোলে বিরাট সমুদ্র বন্দর, যাকে তারা পোর্ট গ্রান্দে বলত। পর্তুগিজরা ফিরিজি নামে পরিচিত ছিল। মগ ও ফিরিজিরা মিলে বাংলা থেকে মুসলমান-হিন্দু নারী-পুরুষদের অপহরণ করে নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার ঔপনিবেশিক শক্তি ডাচদের কাছে দাস হিসেবে বিক্রি করে দিত। জলদস্যুরা বন্দিদের হাতের তালু ছিদ্র করে তার মধ্যদিয়ে পাতলা বেত চালিয়ে একজনকে আরেকজনের সঙ্গে বেঁধে জাহাজের পাটাতনের নিচে পশুর মতো ফেলে রাখত। খাওয়ার জন্য প্রতিদিন মুরগীর খাবার দেয়ার মত কিছু চাল ছিটিয়ে দিত। পরে বন্দি পুরুষদের দাস হিসেবে বিদেশে বিক্রি করে দেয়া হতো। বন্দি নারীদের দিনের পর দিন ধর্ষণ করত কুখ্যাত এই মগ ও ফিরিজিরা। মগদের অরাজকতাকে কেন্দ্র করেই বাংলা ভাষায় ‘মগের মুল্লুক’ প্রবাদটির উৎপত্তি হয়েছে। ‘মগের মুল্লুক’ প্রবাদটি সাধারণত অরাজকতা ও স্বেচ্ছাচারিতা বলতে বোঝায়। মগ ও ফিরিজি জলদস্যুদের সম্পর্কে বংশীদাশ খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে তার রচিত ‘মনসা মঙ্গল’ কাব্যগ্রন্থে লিখেছেন<sup>৩১</sup>।

মগ ফিরিজি যত  
বন্ধুক পালিতা হাত  
এক বারে দশ গুলি ছোটে ।।

১৬০৭ সালে ফরাসি পরিব্রাজক ডি লাভালের চট্টগ্রাম সফরের সময় পর্তুগিজ জলদস্যু গঞ্জালেস সন্দীপ দখল করে রেখেছিল। আরাকান রাজ মিন রাজাগি ওরফে সেলিম শাহের মৃত্যুর পর ১৬২২ সালে তার বড় ছেলে মিং খা মৌং হোসাইন শাহ নাম ধারণ করে সিংহাসনে

আরোহন করেন<sup>৩২</sup>। তিনি যুবরাজ অবস্থায় ডি ব্রিটো নামক এক জলদস্যুর হাতে কিছুদিন বন্দি ছিলেন। বন্দি অবস্থায় যুবরাজ নিরীহ মানুষকে অন্যায়ভাবে লুণ্ঠন ও হত্যা করার বিভিন্ন প্রক্রিয়া স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। ফলে তিনি পর্তুগিজদের খুব ঘৃণা করতেন, তাদের সুনজরে দেখতেন না। অন্যদিকে, মিং খা মৌং বা হোসাইন শাহের ভাই চট্টগ্রামের শাসক অনাপুরামের সাথে পর্তুগিজ জলদস্যু গঞ্জালেসের সখ্যতা গড়ে ওঠে, যেটা হোসাইন শাহ ভালোভাবে নেননি। অনাপুরাম আরাকান আক্রমণ করতে পারে এই ভয়ে হোসাইন শাহ ওরফে মিং খা মৌং তাকে শায়েস্তা করার জন্য চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন। পর্তুগিজদের সাহায্যে অনাপুরাম আরাকান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়ে স্বন্দীপে গাঞ্জালেসের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে অবশ্য গঞ্জালেস বিষয়প্রয়োগে অনাপুরামকে হত্যা করেন এবং তার বোনকে খ্রিষ্টান ধর্মে দিক্ষিত করে বিয়ে করেন। যাহোক রাজা মিং খা মৌং ওরফে হোসাইন শাহের তৎপরতায় ফিরিজি ও মগদের দৌরাত্ম কমতে থাকে। পরবর্তীকালে ১৬৬৬ সালে মুঘল সুবাদার শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম দখল করলে মগ ও ফিরিজি তথা পর্তুগিজদের জলদস্যুতা বন্ধ হয়ে যায়। তবে কিছুদিন বন্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে আবারও জলদস্যুতায় নেমে পড়ে মগ ও ফিরিজি দস্যুরা। আরাকান রাজ সান্দা উইজ্যা ১৭১৯ সালে অতর্কিতভাবে চট্টগ্রামে হামলা চালালেও তা দখলে ব্যর্থ হন।

পরে তিনি পর্তুগিজ জলদস্যুদের সাথে হাত মেলান। রাজা সান্দা উইজ্যার প্রত্যক্ষ সহায়তায় আবারও বাংলার উপকূল এলাকায় মগ-ফিরিজিদের জলদস্যুতা বেড়ে যায়। তারা আবারও মানুষের বাড়িঘর লুটপাট ও অপহরণে মেতে ওঠে। পেছনের এই কদর্য অতীত মুছে ফেলার জন্যই মগরা পরিচয় বদলে রাখাইন সেজেছে।

রাখাইনদের দাবি, প্রাচীনকালে তাদের জন্মভূমিকে রখইঙ্গ বা রাখাইং (Rakhaing) বলা হত<sup>৩৩</sup>। রখইঙ্গ শব্দটি সংস্কৃত ‘রক্ষ’ (Raksha) এবং পালি ‘যক্ষ’ (Yokkho) অর্থাৎ রক্ষ ও যক্ষ শব্দ হতে উৎপন্ন হয়েছে। রখইঙ্গ শব্দের অর্থ হলো দৈত্য বা রাক্ষস। রাক্ষস বলতে এমন দৈতকে বুঝায় যা দেখতে অর্ধেক মানুষ এবং অর্ধেক পশু, বাস্তবে যার কোনো ভিত্তি নেই। এটি একটি কল্পকাহিনী নির্ভর উপাখ্যান। মগ বা রাখাইনরা আরাকানকে রাখাইংপে বা রাখাইনদের ভূমি বলে দাবি করে। নিজেদের আরাকানের আদিবাসী হিসেবে প্রমাণ করতে এমন গল্প সাজিয়েছে মগ তথা রাখাইনরা।

১৯৩১ সালের ব্রিটিশ আদমশুমারির রিপোর্টে বাংলাদেশে মগ জনগোষ্ঠীর উদ্ভব নিয়ে কিছু কথা বলা হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, এরা সবাই আরাকান থেকে আগত<sup>৩৪</sup>।

১৭৮৪ সালে বর্মী রাজ বোধপায়া আরাকান দখল করার পর রোহিঙ্গা মুসলমানদের মতো মগরাও রাজার কোপানলে পড়েন। বোধপায়া মগ ও রোহিঙ্গা মিলিয়ে প্রায় দু লাখ আরাকানীকে হত্যা করে এবং সমসংখ্যককে দাস হিসেবে বার্মায় প্রেরণ করে<sup>৩৫</sup>। বোধপায়ার অত্যাচারের ভয়ে মুসলমানদের সঙ্গে মগরাও পালিয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় নেন। ইংরেজরা কক্সবাজার, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে মগ বা রাখাইনদের থাকতে দেয়। পরে তাদের একটি দল পটুয়াখালিতে গিয়ে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে। বাংলাদেশে বসতি গড়ে তোলা মগরা পাকিস্তান আমলে নিজেদের পরিচয় দিতে শুরু করে মারমা হিসেবে<sup>৩৬</sup>। মারমাদেরই এক অংশ আবার নিজেদের রাখাইন হিসেবে পরিচয় দেয়। এরা এখন প্রধানত বাস করেন পটুয়াখালী জেলায়। বাংলাদেশে শিক্ষাসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে তারা।

এবার আসা যাক বর্মীরা কখন আরাকানে এসেছে সে প্রসঙ্গে। বর্মীরা আসলে দখলদার এবং নির্যাতক হিসেবেই আরাকানে এসেছে। আগেই বলা হয়েছে, ইয়োমা পর্বতমালা দ্বারা বার্মার মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা হওয়ায় আরাকান কখনোই বার্মা তথা মিয়ানমারের অংশ ছিল না। প্রাচীনকালে বার্মা কোন একক রাষ্ট্র ছিল না। সেখানে থেটন, পেগু, পঁগা, আভা ও প্রোম-পাঁচটি রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল<sup>৩৭</sup>। এরমধ্যে আনাওয়ারাথা (১০৪৪-১০৭৭) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পঁগা রাজ্য বিশাল শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। বর্মি রাজা আনাওয়ারাথা ১০৫৭ সালে আরাকান রাজ্য দখল করেন। এরপর ১৪০৬ সালে বর্মী রাজা মেঙ শো আই আরাকান রাজ মিন সুয়া মুন বা নরমিখলাকে হটিয়ে আরাকান দখল করেন<sup>৩৮</sup>। যদিও ১৪৩০ সালেই মিন সুয়া মুন বাংলার সুলতানের সহায়তায় হতরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।

সর্বশেষ ১৭৮৪ সালে আরাকানে বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে বর্মি রাজা বোধপায়া আরাকান দখল করেন<sup>৩৯</sup>। ক্ষমতা লোভী সামন্তদের অনুপ্রেরণায় আরাকানীরা বাদ্য বাজিয়ে বোধপায়াকে স্বাগত জানালেও মাসখানেক পরই তার আসল চেহারা ফুটে ওঠে। বোধপায়ার সৈন্যরা বর্বরতা, নির্যাতন, নির্মম উন্মত্ততা ও পাশবিকতায় মেতে ওঠে। বর্মি সেনারা লুণ্ঠন, হত্যা, মানুষকে বন্দি করে মুক্তিপণ আদায়, নারীদের ধর্ষণসহ নানাবিধ অত্যাচার শুরু করে। ক্ষমা লাভের ঘোষণায় যুদ্ধে পরাজিত আরাকান রাজ থামাড়ার সৈন্যরা অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করলে বোধপায়ার বাহিনী তাদের সবাইকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। আরাকানী নারীদের আটক করে বার্মায় নিয়ে যৌনদাসী বানায় বোধপায়া। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, জীবনের ভয়ে দুলাখ আরাকানী (রোহিঙ্গা ও মগ মিলে) পালিয়ে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে



আশ্রয় গ্রহন নেন। আরাকানে বর্মি রাজা বোধপায়ার অচ্যাচারের মাত্রা যে কতটা ছিল, তা ১৭৯৯ সালে ব্রিটিশ লেখক ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিল্টন এর বই ‘বার্মা সাম্রাজ্য-তে পাওয়া যায়। তিনি উল্লেখ করেন, বর্মিরা যখন আরাকান দখল করে তখন এটি ছিল, একটি ‘মৃত্যুপুরী’। পরবর্তীকালে ব্রিটিশদের হাতঘুরে ১৯৪৮ সালে তথাকথিত স্বাধীনতার নামে আরাকানকে চিরতরে বার্মা তথা আজকের মিয়ানমারের হাতে তুলে দেয় ইংরেজরা। চিরদিনের জন্য আরাকান বর্মিদের উপনিবেশে পরিণত হয়। পূর্বে বিরোধ থাকলেও পরবর্তীকালে ধর্মীয় কারণেই অর্থাৎ একই ধর্মের অনুসারী হওয়ায় বর্মি এবং মগদের মধ্যে গভীর যোগসূত্র এবং ঐক্য স্থাপিত হয়। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় তাদের এ ঐক্য একদিকে যেমন দৃঢ় হয়েছে তেমনি উগ্র ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক চেতনা তাদের ততটাই মুসলিম বিদ্বেষী করে তুলেছে। দুপক্ষই এখন একত্র হয়ে রোহিঙ্গাদের নিপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

### রোহিঙ্গারা বহিরাগত হলে বর্মি-রাখাইন সবাই বহিরাগত

উপরের আলোচনা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার, তা হলো— বসবাসের জন্য উপযোগী পরিবেশ থাকায় প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন সময় নানা স্থান থেকে হরেক রকম জনগোষ্ঠীর মানুষ এসে আরাকানে বসতি গড়ে তুলেছে। ইতিহাসের তথ্যমতে, হাজারেরও অধিককাল পূর্বে যেমন জৈন, হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা এসেছে তেমনি তিব্বত, মঙ্গোলীয়, বার্মা, ভারতবর্ষ, বাংলা, আরব অঞ্চল থেকে নানা জনসম্প্রদায়ের লোকজন এসে আরাকানে বসতি স্থাপন করেছে। কালক্রমে তারা কেউ মগ বা রাখাইন, কেউ রোহিঙ্গা নামে পরিচিতি পেয়েছে। ইতিহাস মতে এ সত্যটি অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু আরাকান দখলদার মিয়ানমার সরকার ও সেনাবাহিনী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শুধুমাত্র রোহিঙ্গাদেরই বহিরাগত বলে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। অনেকেই ইতিহাস না জেনে তাদের সাথে সুর মিলিয়ে রোহিঙ্গাদের বহিরাগত বলছেন, যা মোটেই যুক্তিসংগত নয়। হাজার বছর ধরে বসবাসকারী রোহিঙ্গা মুসলমানরা আরাকানে বহিরাগত হলে মুসলমানদের কিছুকাল পূর্বে আসা রাখাইন এবং পরে আসা বর্মিরা তাহলে কী? এই সূত্রে তারাও তো তাহলে বহিরাগত। মুসলমানরা বরং বর্মিদের অনেক আগে আরাকানে গেছে। মুসলমানরা গেছে সপ্তম-অষ্টম শতকে আর বর্মিরা গেছে ১০৫৭ সালে বর্মিরাজা আনাওয়ারাথা আরাকান দখলের পরে। একারণে বর্মি সরকার ও বর্বর সেনাবাহিনী কোনোভাবেই রোহিঙ্গাদের বহিরাগত বলতে পারে না। রোহিঙ্গাদের বহিরাগত বলার নৈতিক ভিত্তি তাদের নেই।

৭১২ সালে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পরপরই ভারতবর্ষ ও বাংলায় ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করে। পরবর্তী সময়ে আরব, ইরান, আফগান, তুর্কি এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে আউলিয়া-দরবেশ, সুফি সাধক, ধর্ম প্রচারক এ অঞ্চলে এসে ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটান। ইসলামের সুমহান প্রভাবে বাঙ্গালি হিন্দু এবং অন্য ধর্মাবলম্বীরা ব্যাপকভাবে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেন। বাইরে থেকে আসা মুসলমানরা যেমন বসতি গড়েন তেমনি স্থানীয় বাঙ্গালি ও ভারতীয়রা পৈতৃক ধর্ম বাদ দিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এভাবে বাইরে থেকে আসা এবং স্থানীয়দের সম্মিলনে ভারতবর্ষে মুসলমান জাতির সৃষ্টি হয়, মুসলমানরা বিস্তৃত হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাঙ্গালি ও ভারতীয় মুসলমানরা কি তাহলে বহিরাগত? হাজার হাজার বছর ধরে বসবাস করে আসা বাঙ্গালি ও ভারতীয়দের উত্তরসুরি যারা পরবর্তীকালে মুসলমান হয়েছেন তারা কি এই দেশের নাগরিক নন? যদি ভারতবর্ষের মুসলমানরা বহিরাগত না হন তবে আরাকানের ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীদের পরবর্তী রোহিঙ্গা মুসলমান প্রজন্ম কেন বহিরাগত হবেন?

কালের বিবর্তনে মুসলিম হবার পরে হয়তো রোহিঙ্গা তকমা এককভাবে ধর্ম পরিবর্তনকারীদের গায়ে লেগেছে তাই বলে তাদের বহিরাগত বলা কোনোভাবেই যুক্তিসঙ্গত ও ইতিহাস নির্ভর নয়। আরব মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে স্থানীয় যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হন তারা এবং তাদের পূর্বপুরুষরা তো একই জনগোষ্ঠীর মানুষ। তারা বংশ পরম্পরায় খ্রিষ্টপূর্বাব্দ কাল থেকে সেখানে বসবাস করে আসছিলেন। হয়তো ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে তারা রোহিঙ্গা নামে পরিচিত ছিলেন না। তাহলে শুধু ধর্ম পরিবর্তনের কারণে বংশ পরম্পরায় বসবাসকারী আরাকানবাসী রোহিঙ্গারা বহিরাগত হবে কোন দুঃখে? হাজার বছরের অধিককাল আগে থেকে বসবাস করে আসা একটি জনগোষ্ঠীকে কি বহিরাগত বলার আর কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকতে পারে? তাহলে কি শুধু মুসলমান হবার কারণেই তাদের বহিরাগত বলা হচ্ছে না? ১৬/১৭ প্রজন্ম অতিক্রম করে জন্মসূত্রে এখানকার বাসিন্দা হলেও রোহিঙ্গারা মিয়ানামরের নাগরিক নয় কেন? কত বছর ধরে একটি জনগোষ্ঠী একটি দেশে বসবাস করলে তারা নাগরিকত্বের অধিকারী হতে পারে? নৃতাত্ত্বিক একটি গোষ্ঠীকে যে শুধু ধর্মীয় পরিচয়ের কারণেই উগ্র বৌদ্ধবাদী মগ ও বহিরাগত বর্মীরা বিতাড়িত করতে চায় তা দিবালোকের মতো আজ পরিষ্কার।

অতীতে বিভিন্ন সময় মুসলমানরা কাজের সন্ধানে, অথবা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কিংবা ধর্মপ্রচারের নিমিত্তে আরাকান গিয়েছে। কেউ কেউ উদ্দেশ্য সাধনের পর নিজ নিজ আলয়ে ফিরে গেছেন। আবার অনেকেই সেখানে বসতিও স্থাপন করেছেন। এভাবে যাওয়া

মুসলমানদের মাধ্যমে হয়তো আরাকানে মুসলিমদের বংশ বিস্তারে কিছুটা সংযোজন হয়েছে। তাই বলে তাদের দ্বারা এরকম লাখ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়েছে বলাটা যুক্তিসঙ্গত নয়। এ তথ্য শুধু অসম্পূর্ণই নয় বরং হাস্যকরও বটে। যেভাবেই হোক মুসলমানদের এই যাওয়াও তো শত শত বছর আগের ঘটনা। তাহলে সেখানে বসবাসকারী বর্তমান রোহিঙ্গা প্রজন্ম কী করে বহিরাগত হয়? ব্রিটিশরা আরাকান দখলের পর বিতাড়িত বর্মি নরপিশাচ বোধপায়া কর্তৃক বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের অনেকেই আবার স্বদেশ ভূমি অর্থাৎ আরাকানে ফিরে গিয়ে নতুনভাবে বসতি গড়ে তোলে। তাহলে নিজ দেশে প্রত্যাভর্তনকারী এই রোহিঙ্গাদের কি বহিরাগত বলা যাবে?

১৬৬৬ সালে শায়েস্তা খান দখল করার আগ পর্যন্ত ইতিহাসের বেশিরভাগ সময় আরাকান ও চট্টগ্রাম একই রাজ্যের অধীন ছিল। সুতরাং একই রাজ্যের এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে যাওয়া বা বসতি স্থাপন করা তো দোষের কিছু নয়। রাজ্য দখল করেছে তো রাজনীতিক বা শাসকরা, সাধারণ মানুষ তো নয়। সুতরাং কোন অঞ্চল কখন কোন দেশে গেল এর দায়ভার তো সাধারণ মানুষের ওপর পড়তে পারে না। সেসময় বাসিন্দারা স্বাধীনভাবে চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে আরাকান, আবার আরাকান থেকে চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেছে এবং সে সংখ্যাটিও নিশ্চয়ই পুরো জনগোষ্ঠী নয়। সুতরাং আরাকান ও চট্টগ্রামের কোন অঞ্চলে কে আদিবাসী আর কে অভিবাসী তা কি কেউ হলফ করে বলতে পারে?

বর্মিদের অত্যাচারের মুখে ১৯৪৭ সালে রোহিঙ্গা নেতৃত্বের একটি অংশ পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আহ্বান প্রকাশ করেছিল। তারা আরাকানকে তৎকালীন পাকিস্তানভুক্ত করার জন্য গণভোট দাবি করেছিলেন, এটা সত্য। যদিও জিন্নাহর অনাহ্বান ও ব্রিটিশদের কূটচালে তা সম্ভব হয়নি। তবে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হতে আহ্বানীরা তো হত্যা-ঘৃণা-লুণ্ঠন চালায়নি কারও ওপর! পরবর্তীকালে মিয়ানমারের রাজনীতিতে রোহিঙ্গাদের অংশগ্রহণ প্রমাণ করে- তারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার রাজনীতি করেনি। আসলে মিয়ানমারে প্রবল হয়ে উঠেছে বর্ণবাদী জাতীয়তাবাদ। এর বিরুদ্ধেই লড়াই করছে মিয়ানমারের অ-বর্মি দশটি জাতিগোষ্ঠী (কাচিন, কারেন)। তাদেরও কি রোহিঙ্গাদের মতো ‘বহিরাগত’ বলা হবে?

১৭৯৯ সালে প্রকাশিত ব্রিটিশ লেখক ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিল্টন এর বই ‘বার্মা সাম্রাজ্য’ তে পাওয়া যায় রোহিঙ্গারা আরাকানের স্থানীয় বাসিন্দা<sup>৪০</sup>। বইটিতে লেখক উল্লেখ করেন, মুহাম্মাদ (সা.)-এর অনুসারীরা যারা আরাকানে দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করছে, তাদেরকে “রুইঙ্গা” অর্থাৎ ‘আরাকানের স্থানীয় বাসিন্দা’ বা ‘আরাকানের অধিবাসী’ বলা হয়।

মিয়ানমারের কান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ও বর্মি ইতিহাসবিদ আয়ে চানের দীর্ঘ গবেষণালব্ধ অভিমত হলো- মোহামেডানগণ (মানে মুসলমান) আরাকানের দীর্ঘ দিনের বাসিন্দা। বর্মি ইতিহাসবিদ থান্ট মি ইন্ট উ এর মতামতও একই। সুতরাং রোহিঙ্গারা যে আরাকানের প্রাচীনতম জাতিগোষ্ঠী, তা ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিল্টনের বই থেকে পরিষ্কার। বার্মা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয় ১৮২৬ সালে। আর বইটি প্রকাশিত হয় ১৭৯৯ সালে। অর্থাৎ ব্রিটিশরা আরাকান তথা বার্মা যাবার আগেই সেখানে রোহিঙ্গা মুসলমানরা বাস করত। সুতরাং ব্রিটিশ আমলে শ্রমিক হিসেবে আরাকানে যাওয়া বাঙ্গালি মুসলমানরাই রোহিঙ্গা-উগ্র বর্মিদের এমন দাবি ডাহা মিথ্যা কথা।

মিয়ানমারের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মিন অংহ্লাইং ও স্টেট কাউন্সিলর অং সান সু চি রোহিঙ্গাদের ‘বাঙ্গালি’ হিসেবে দাবি করছেন। অং সান সু চি ও মিন অংহ্লাইং-এর দাবি যে কত স্ববিরোধী, তা বহুভাবেই প্রমাণযোগ্য। ১৯৪৮ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সুলতান মাহমুদ, আবুল বাশার, আবদুল গাফ্ফার, জোহরা বেগম প্রমুখ যে আরাকানের মুসলিম প্রধান এলাকাগুলো থেকে এমপি নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, বছরের পর বছর মন্ত্রীও হয়েছিলেন, সেটা কীভাবে সম্ভব হলো? এই ব্যক্তির কীভাবে নির্বাচনে দাঁড়ালেন? আকিয়াবের এমপি সুলতান মাহমুদ যে উ নুর নেতৃত্বে গঠিত ১৯৬০-এর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন, সেটা কোন জাতিসত্তার পরিচয়ে? এমনকি ১৯৯০-এ সামরিক বাহিনীর অধীনে পরিচালিত নির্বাচনে রোহিঙ্গারা কীভাবে উত্তর আরাকান থেকে পার্লামেন্টে নির্বাচিত হতে পারলেন? কীভাবে তখন আরাকানের রোহিঙ্গারা নিজস্ব রাজনৈতিক দল ‘ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস পার্টি’ থেকেই প্রার্থী হতে অনুমতি পেয়েছিলেন? ১৯৯৮ সালে সু চি আহৃত ‘পিপলস পার্লামেন্টে’ ১৯৯০-এর নির্বাচনে বিজয়ী এমপি শামসুল আনোয়ারকে রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধি হিসেবেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আজকের স্টেট কাউন্সিলর সু চি। তাহলে দেড় দশকের ব্যবধানে সেই সু চিই কীভাবে আজ বলছেন রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নাগরিক নন? রেঙ্গুনের ইনস্টিটিউট অব ইকোনমিকস থেকেই শামসুল আনোয়ার তাঁর ব্যাচেলর ডিগ্রি নিয়েছিলেন এবং ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সরকারি মাধ্যমিক একটি স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। নাগরিক না হলে তাঁর পক্ষে কীভাবে দীর্ঘ শিক্ষা ও কর্মজীবন পরিচালনা করা সম্ভব হলো? জেনারেল মিন অং এবং সু চি জাতিঘৃণার প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে রোহিঙ্গাদের বাঙ্গালি বলে আখ্যা দিচ্ছেন। এটা করে তারা কার্যত মিয়ানমারের রাজনৈতিক ইতিহাসকেই অস্বীকার করছেন। বার্মার প্রথম প্রেসিডেন্ট উ নু রোহিঙ্গাদের আরাকানের অধিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন<sup>৪১</sup>। ১৯৪৭ সালে বার্মার প্রথম সংবিধান সভার নির্বাচনে রোহিঙ্গারা ভোট দিয়েছিল। ১৯৫১ সালে তারা

পায় আরাকানের অধিবাসী হিসেবে পরিচয়পত্র। ১৯৫৯ সালে প্রধানমন্ত্রী উ বা রোহিঙ্গাদের আরাকানের জাতিগোষ্ঠী বলে অভিহিত করেন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীন বার্মার প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম শাও সোয়ে থাইক বলেছিলেন, ‘রোহিঙ্গারা স্থানীয় অধিবাসী না হলে আমিও বহিরাগত<sup>৪২</sup>।’

জন্মের পর চোখ খুলেই যে আকাশ দেখেছে, যে বায়ু গ্রহণ করেছে, যে মাটিতে প্রথম পা রেখেছে, সেই ভূখণ্ডে কী করে রোহিঙ্গারা বহিরাগত হন ? যে দেশে নিজের জন্ম, পিতার জন্ম, পিতামহের জন্ম এবং তাদের পূর্ব পুরুষদেরও জন্ম, কী করে তারা সে দেশের নাগরিক নন? পৃথিবীর কোনো আইনই বলতে পারবে না বংশ পরম্পরায় বসবাস করে আসা একটি জনগোষ্ঠী সেই এলাকার বাসিন্দা নন। আর যদি রোহিঙ্গারা বহিরাগতই হন তাহলে ইতিহাস মতে বর্মি এবং রাখাইনরাও আরাকানে বহিরাগত।